কিশোর ভারতী

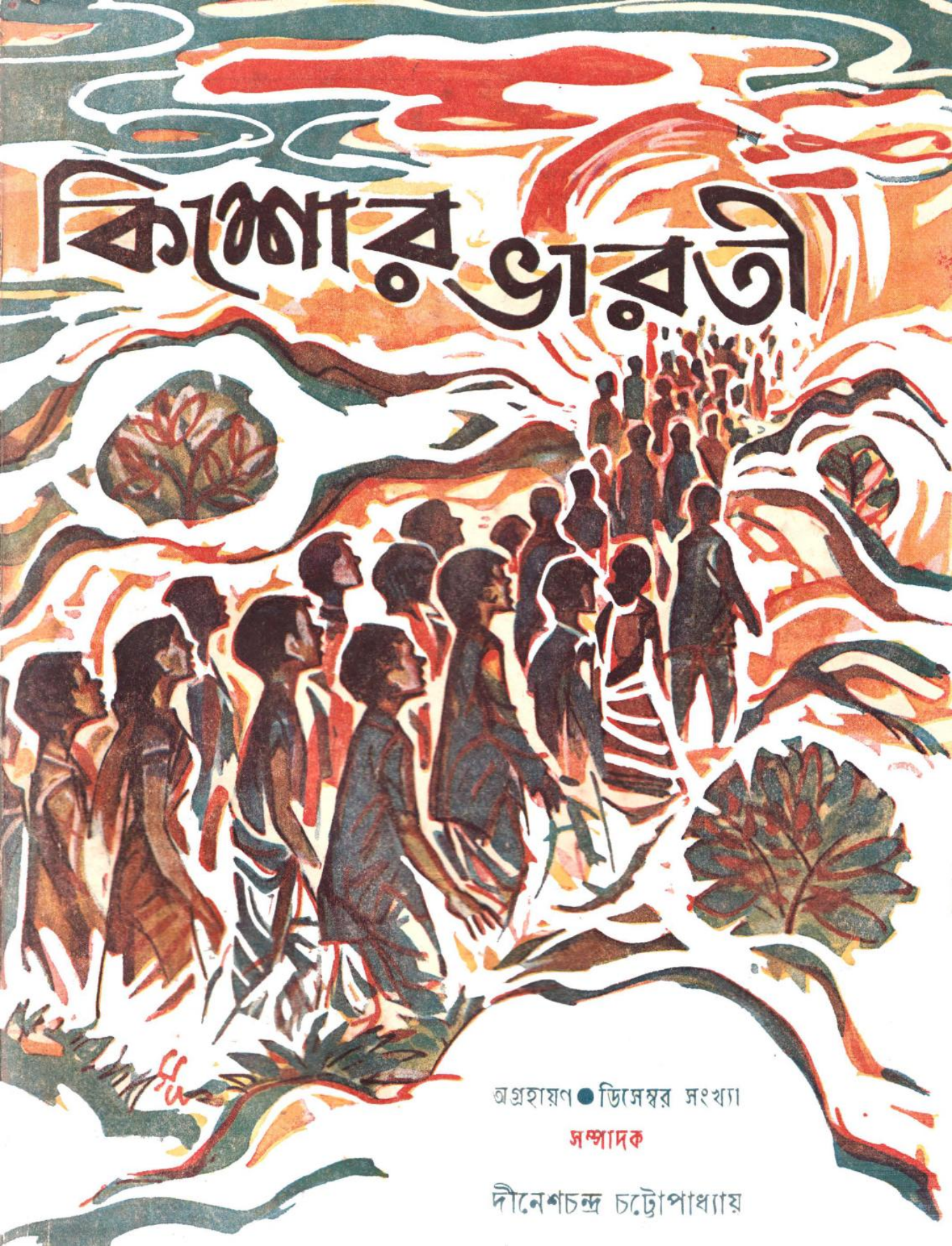

অগ্রহায়ণ ● ডিসেম্বর সংখ্যা

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

সুলভ মূল্যে শ্রেষ্ঠ উপহার

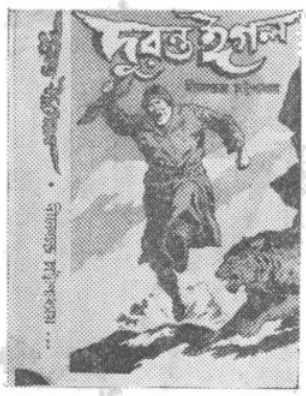

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা সাহিত্যে নজিরহীন চিরায়ত সৃষ্টি

দুরন্ত ঈগল

সুলভ জ্যাকেট-সংস্করণঃ **৩৫২ পৃষ্ঠার** বইয়ের দাম মাত্র **আঠারো টাকা** ॥

দুর্লঙ্ঘ্য ভয়াল পামীর। লোকে বলে পৃথিবীর ছাদ। জনহীন পামীরের বুকে একখানি ছোট গ্রাম—মিন্-আরখার! সেই গ্রামে একদিন জাগল চাঞ্চল্য—নতুন আগন্তুক এরা কারা?.....

এই মহান্ উপন্যাসের অশেষ বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক সংস্থান। কোথাও অসংখ্য তুষার-মৌলি দুর্গম পর্বতরাজ্য, কোথাও বা ধু-ধু মরুপ্রান্তর। আবার কোথাও রয়েছে শ্যামলসুন্দর জনপদ। তেমনি এখানে চলমান অজস্র চরিত্রের মিছিল—বিভিন্ন জাতির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বাঙ্ময় এই সুবিশাল উপন্যাস। এদের মধ্যে আছে যেমন বিপ্লবী দেশপ্রেমী, আছে প্রতিবিপ্লবী গুপ্তচরও—খুনী সংঘবদ্ধ লুঠেরার দল। তাই তো **যুগান্তর** পত্রিকা বলেনঃ .....দুরন্ত ঈগল সত্যিই এক দুরন্ত দুর্ধর্ষ বই। **দেশ** পত্রিকা ব্যক্ত করেনঃ কিশোরদের উপযোগী এমন বিপুলায়তন ও সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্প্রতি পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। **পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা** লেখেনঃ সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার এই মহা-গ্রন্থের পাঠকের রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টির সামনে অভিনীত হয়ে চলে মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী মহাবৈপ্লবিক ঘটনাবলী। বারবারই স্মরণ করিয়ে দেয় আরও দুখানি মহাগ্রন্থের কথা—শলোকভের 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন' এবং অস্ত্রোভ্স্কির 'হাউ দ্য স্টিল ওয়াজ টেম্পারড্'। প্রয়াত কবি **মনীশ ঘটক** হন উচ্ছ্বসিতঃ এ যে মহাকাব্য, এ যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কতিপয় রচনার অন্তর্গত একটি।

যে বইয়ের তুলনা নেই

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সেই বিস্ময়কর বিচিত্র উপন্যাস

নাম তার ভাবা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ **প্রসাদ রায়** ॥ দাম মাত্র **আট টাকা** ॥

দৈনিক সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে বের হয়েছিল খবরটা। তরাইয়ের গহন জঙ্গলে দুই ব্যাঘ্র-শিকারী খোঁজ পেয়েছেন এক অদ্ভুত ভালুক পরিবারের। যে পরিবারের অন্যতম সদস্য একটি জলজ্যান্ত মানবসন্তান!..... তারপর?.....একনিশ্বাসে পড়বার মত এই উপন্যাসটি কিশোর ভারতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বন্যার মত এসেছিল অসংখ্য প্রশংসা-অভিনন্দন। **যুগান্তর** পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেনঃ সব মিলিয়ে সত্যিই ভালো লাগার মতো একটি কিশোর উপন্যাস।

আসন্ন শীতের প্রাক্কালে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্রিকেটের একখানি অনবদ্য বই

সুন্দর ক্রিকেট

উত্তুরে হাওয়া জানান দিয়ে যায়, শীত আসছে। সঙ্গে নিয়ে আসছে মিঠে রোদ্দুর, নলেন গুড়, টাটকা সব্জি এবং.....হ্যাঁ ক্রিকেট। সেই উপভোগ্য সুন্দর ক্রিকেট, যা দেখতে দেখতে দর্শকরা উত্তেজনায় শিহরিত হবেন, কখনও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠবেন তারিফ জানাতে। সত্যি, ক্রিকেট-

খেলার কোন জুড়ি নেই। ক্রিকেটের তেমন তেমন বই হলেও অবশ্য কমতি নয়। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্রীড়াসাহিত্যের অঙ্গনে নতুন করে পরিচয় করানো নিষ্প্রয়োজন।
তাঁর এই সাম্প্রতিকতম বইখানি ক্রিকেটের সুন্দর রূপটিই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। অজস্র ছবিতে সাজানো এই বইটির প্রচ্ছদ ও ছবি এঁকেছেন সুফি। বইটির দাম মাত্র **সাড়ে সাত টাকা**।

বিনামূল্যে বহুবর্ণ পুস্তক-পরিচয় পুস্তিকার জন্য লিখুন

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পত্র ভারতীর প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

পঞ্চদশ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ॥ ডিসেম্বর ১৯৮২

সম্পাদক **দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

- পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের জন্য মাসিক কিশোর-পত্রিকারূপে অনুমোদিত [৪. ৮. ১৯৮২ তারিখের ৬৩৬ (১৬) টি বি সি/২এ-২টি/৮১নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]
- পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [১৭. ৩. ৭২ তারিখের টি. বি. নং ৩ দ্রষ্টব্য।]
- আসাম শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরী পুস্তক-রূপে অনুমোদিত। [২. ৭. ৭১ তারিখের ই জি/এম আই. এস সি/২৩/৭০/৩২/ (এ) নং মেমো দ্রষ্টব্য।]
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহের ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫. ৯. ৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]

পত্র ভারতী (কিশোর ভারতী কার্যালয়) ঃ ৩/১ কলেজ রো, **কলিকাতা** ৭০০ ০০৯ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্টল ও বইয়ের দোকান ॥

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ॥

মূল্য দুই টাকা ॥

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বিপ্লবী নায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মরণে ১৪৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ পটভূমিতে রুদ্ধশ্বাস ধারাবাহিক উপন্যাস

অগ্নিরথ—সংকর্ষণ রায় ১৬৫

গরিমাময় ইতিহাসের বর্ণাঢ্য গল্প

ইতিহাসে নেই—অভীক হালদার ১৭৫

অনাবিল মধুর গল্প

আদুরী—শ্যামাদাস দে ১৬০

গা ছমছম অরণ্যের কাহিনী

রোমাঞ্চকর অরণ্য-রাত্রি—তুষারকান্তি বসু ১৬৯

মানবিক মূল্যবোধের গল্প

আপনজন—অশোককুমার সেনগুপ্ত ১৫৩

বিশ্বসাহিত্যের রহস্য গল্প

মৌমাছির গল্প—গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮২

বিশেষ রচনা

বিস্মৃতপ্রায় সেই মানুষটি ঃ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি—ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩

ভ্রমণ কাহিনী

মালয়েশিয়ায় একুশ দিন—অসিতকুমার চৌধুরী ১৯২

সর্পসংকুল নিবন্ধ

আফ্রিকায় সাপের সন্ধানে—অবনীভূষণ ঘোষ ১৮৮

ছবিতে কবিতা

ঘর কন্যা—মুকুল চট্টোপাধ্যায় ১৮০

মাকে—সুধীন্দ্র সরকার ১৮০

একটি তীর ঃ একটি গান—অম্লান ভট্টাচার্য ১৮১

আমি—তাপসকুমার মণ্ডল ১৮১

ছবিতে কীর্তিমান মানিকজোড়ের গল্প

নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ১৫২

ছবিতে মানবইতিহাসের রুদ্ধশ্বাস গল্প

পদক্ষেপ—নির্বেদ রায় ও রাজা রায় ১৫৮

ছবিতে বিচিত্র হাস্যরহস্যের গল্প

স্পাই জিরো জিরো ওয়ান—সুফি ২০২

জানবার কথা

কত অজানারে—হীরক দাশ ১৫৭

অভিনব-আশ্চর্য ঘটনা
বিচিত্র এই বসুন্ধরায়—হীরক দাশ ১৬৮ ও ১৯১
খোলামনের মেলাতে ● সুজনবন্ধু
বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিতর্ক চলেছে ২০০
বিজ্ঞানীর দপ্তর ● কিশোর বিজ্ঞানী
নিজে করো : বিস-কুটকুট কুটকুট—গঙ্গেশ ঘোষ ও মদন মুখার্জী ১৯৫
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা—পরেশ দত্ত ১৯৫
বিজ্ঞান বিস্ময়—পরেশ দত্ত ১৯৬
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
গ্রামের নাম মাদপুর—মফিকুল হাসান ১৯৭
পাঠকপাঠিকার আসর ● আনন্দবর্ধন
রাজুর ইঁদুর—অলোক সেন ১৯৯
জলসা—গৌতম গলুই ১৯৯
ধাঁধা হেঁয়ালি ● গোরখনাথ
খবরাখবরের ধাঁধা—শিবকৃষ্ণ ২০৪
বিশেষ এশিয়াড প্রতিবেদন
এশিয়াড : পর্যালোচনা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫
খেলাধুলো ● শ্রীসাংবাদিক
মুখতোড় জবাব ২০৯
যোগ্য জবাব ২১০
এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২১০
আবার জাতীয় ফুটবল ২১১
পত্রিকা সম্পর্কিত পর্যালোচনা
সাম্প্রতিক কিশোর ভারতী ও তার মূল্যবৃদ্ধি/আমাদের সিদ্ধান্ত ২১২
সওয়াল জবাব ● বাণী মৌলিক
সরস বাতচিৎ ও প্রশ্নোত্তরের আসর ২১৫
সাম্প্রতিক সংবাদ
অজানা উপত্যকার গহনে ২০১
প্রচ্ছদ
আলোর পথযাত্রী

অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির চাপে কিশোর ভারতীর দাম বাড়ছে। অগণন পাঠকবন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আগামী জানুয়ারি থেকে তার দাম হচ্ছে ২·৫০ টাকা॥

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ, জীবনধারণের পক্ষে জল ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা বলার দরকার করে না। অথচ তাদের বিদ্যমানতা বা উপস্থিতি নিয়ে কিন্তু আমরা আদৌ মাথা ঘামাই নে। তারা আছে ও থাকবে, এটা যেন এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনটার অভাব ঘটে, তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, ভাবতে পার ? মুহূর্তে শুরু হবে হাহাকার।

ঠিক তেমনি আমাদের মধ্যে সময় সময় দুর্লভ প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী এমন এক-একজন ব্যক্তির আগমন ঘটে, সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতির দিক থেকে যাঁদের উপস্থিতি সবার পক্ষে এক পরম স্বস্তির ব্যাপার। তাঁরা আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, এটা যেন জল-বাতাসের মতোই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন পার্থিব নিয়মে তাঁদের তিরোধান বা মৃত্যু ঘটে, তখন সকলের অবস্থা হয় মারাত্মক—যেন বজ্রাহত। পরমাত্মীয়-বিয়োগব্যথায় অসহায় বিবশ মন শুধুই হাহাকার করতে থাকে।

ঠিক এমনি এক অবস্থা আমরা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করলাম গত ২৯শে নভেম্বরের বিকেল থেকে, যখন হঠাৎ প্রচারিত হলো যে, বিপ্লবী জননায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত আর নেই, সুদূর চীনের রাজধানী বেইজিং বা পিকিংয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ভয়ঙ্কর এই দুঃসংবাদটি যখন সারা দেশে, বিশেষ করে কলকাতায় তথা পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে পড়লো, তখন অসংখ্য অগুনতি মানুষের ওপর তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। বিনামেঘে বজ্রাঘাতে ব্যক্তিবিশেষ বা কিছু ব্যক্তির যে অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই নিদারুণ খবরে শহরে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষ যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায়।

মন বিকল, চিন্তাশক্তি অসাড়, সবার চোখমুখের অসহায় দিশেহারা ভাব, সবহারানোর নিরুপায় ব্যথা—সে দৃশ্য বুঝি কোনদিনই ভুলবার নয়।

তারপর কি ঘটেছে, তোমরা অনেকে স্বচক্ষে দেখেছ বা খবরের কাগজে পড়েছ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদর দপ্তর থেকে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এলাকায় এলাকায়, মহানগরীর সীমানা ছাড়িয়ে জেলায় জেলায় গ্রামে গঞ্জে শহরে আর খবরের কাগজের পাতায় পাতায় দিনের পর দিন প্রিয় জননায়কের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাসের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি দেখা গেছে, তার কোন পূর্ব নজির আছে বলে জানা নেই।

তারপর ৫ই ডিসেম্বর সকালে পিকিং থেকে চীনা বিমান এসে যখন দমদম বিমানবন্দরে ভিড়লো, তখন সমস্ত এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এবং সে সমুদ্র নিস্তব্ধ নির্বাক। বিমান থেকে যাত্রীরা সবাই নেমে এলেন একে একে, নামলেন না শুধু একজন, শ্রমজীবী মানুষের প্রাণপুরুষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিমান থেকে নেমে এল তাঁর কফিনে-মোড়া নিথর নিষ্প্রাণ মৃতদেহ। স্তব্ধ মৌন

বিপ্লবী নায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মরণে

সুবিশাল জনতার হৃদয়নিংড়ানো অশ্রুভেজা আকুল দীর্ঘশ্বাসে বাতাস তখন ভারী হয়ে উঠেছে ঃ সব শেষ ! আর কোন দিনই ফিরবেন না উনি। অসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে না বলে কয়ে চলে গেলেন চিরকালের মতো।

বিমানবন্দর থেকে প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃতদেহ প্রথমে আনা হয় আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির দপ্তরে, সেখান থেকে অপরাহ্ণে মৃতদেহ নিয়ে শুরু হয় শেষ শোকযাত্রা কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্ববয়সের সর্বভাষার সর্বধর্মের ও সর্বস্তরের রুদ্ধবাক্ জনসাধারণ যেভাবে তাদের বিপ্লবী নায়ককে জানিয়েছে শুধু শ্রদ্ধা আর শ্রদ্ধা আর আকুল প্রণতি, তার বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা, পণ্ডশ্রমমাত্র। অব্যক্ত ব্যথায় ও শোকে মুহ্যমান কলকাতা মহানগরী সেদিন বুঝি বোবা কান্নায় কেঁপেছে থরথর করে।

তারপর এল ৭ই ডিসেম্বর। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মরণসভায় সেদিন যে দৃশ্য দেখা গেল, তা অভূতপূর্ব। কাছের ও দূর-দূরান্তের অগণিত মানুষের স্রোতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড যে সেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় ব্যাপার হলো, সে শোকসভা পরিণত হয়েছিল দলমতনির্বিশেষে সপক্ষ বিপক্ষ সর্ব দল ও মানুষের এক মহাসম্মিলনে। বাম, মধ্য ও দক্ষিণ কোন দলই প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পিছিয়ে ছিল না। এ জাতীয় ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতেও এর আগে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না—স্মরণকালের মধ্যে তো নয়ই।

সে সভায় প্রত্যেক দল থেকে নেতার পর নেতা উঠে যে ভাষায় প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানালেন, সে সবের সার কথা হলো—তাঁর মতো সর্বত্যাগী বিপ্লবী দেশপ্রেমিক, সুদক্ষ সংগঠক, দূরদর্শী নির্ভীক রাজনীতিক, সংবেদনশীল নিরহংকার জননায়ক, শোষিতের একনিষ্ঠ বন্ধু এবং শোষণমুক্ত নতুন সমাজগঠনের আদর্শে অবিচলা নিবেদিতপ্রাণ নায়ক বিরল এবং তাঁর মৃত্যুতে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য-আন্দোলনের যে প্রচণ্ড ক্ষতি হলো ও যে স্থান শূন্য হলো, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

বন্ধু, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। প্রয়াত জননায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এমনও হতে পারে যে, আমরা কেউ কেউ হয়তো তাঁর এই মতাদর্শে বিশ্বাসী নই বা তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁরা মহৎ, তাঁরা যে মতাদর্শেরই মানুষ হোন না কেন মহৎই থেকে যান এবং তাঁরা সর্বজনের নমস্য। শুধু দেখা দরকার, তাঁরা যে মতাদর্শে বিশ্বাসী, তা দেশের ও সমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত মঙ্গল ও অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক কিনা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা।

উপরন্তু সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য এবং যা থেকে আমরা নিজেরাই বিশেষভাবে লাভবান হতে পারি তা হলো—প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মানুষদের জীবনী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অতি সামান্য বা সাধারণ অবস্থা

থেকে, একেবারে নিচু তলা থেকে একের পর এক ধাপ পার হয়ে তিনি যে উপরে উঠে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত লাভ করেছেন 'জনগণ-মন-অধিনায়কে'র বিরল সম্মান এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুস্তর বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে শ্রমজীবী জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে যে বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করে সুশৃংখল সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন, তা কি করে সম্ভব হলো। তাঁকে তো কেউ নিচে থেকে উপরে টেনে তোলে নি, বা উপর থেকে তো কেউ তাঁকে দেশের মানুষের ঘাড়ে নেতা হিসাবে চাপিয়েও দেয় নি, কিংবা এ ধরনের শক্তিশালী সুবিশাল অদৃষ্টপূর্ব সংগঠনও তো আপনাআপনি গড়ে উঠতে পারে না, তাহলে কোথায় এ রহস্যের উৎস? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে প্রয়াত নেতার কার্যাবলী ও জীবনচর্যার মধ্যে যার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিপ্লবী কিশোরের ছবি—পরাধীন দেশের মুক্তিকামী এক অশান্ত কিশোর, অন্তরে জ্বলছে যাঁর দেশপ্রেমের অনির্বাণ বহ্নিশিখা। তারই তাড়নায় সেই কৈশোরেই শুরু হয় তাঁর দুর্গম বন্ধুর পথ-পরিক্রমা।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুঁয়োরপুর গ্রামে ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্তের জন্ম। বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত ছিলেন চিকিৎসক, সরকারী চাকুরে। তাঁর তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তই ছিলেন সকলের বড়। তাঁর ঠাকুরদা অপূর্বলাল দাশগুপ্ত ছিলেন একজন আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক ও সংস্কারমুক্ত জনসেবক। তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের শৈশবজীবনে এবং মনে উপ্ত হয় দেশপ্রেমের বীজ যা পরবর্তীকালের অনুকূল পরিবেশে পরিণত হয় সুবিশাল মহীরুহে। সেই শৈশবেই ঠাকুরদার কাছে তিনি শেখেন উদ্দীপনাময় সব স্বদেশী গান এবং তাঁর প্রেরণায় ও তত্ত্বাবধানে শুরু করেন নিয়মিত শরীরচর্চা ও সাঁতারকাটা, সেইসঙ্গে গান ও অভিনয়েও অংশগ্রহণ করতে থাকেন নিয়মিত। তাছাড়া খেলাধুলোর দিকে, বিশেষতঃ ফুটবল খেলার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। এমনিভাবে ঠাকুরদার নিবিড় স্নেহে ও সাহচর্যে বালক প্রমোদ দাশগুপ্তের শরীর ও মন বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃই।

কুঁয়োরপুর গ্রামের স্কুলেই তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। কিন্তু বাবার বদলির চাকরি এবং মায়েরও রুগ্ণ স্বাস্থ্য। তার ফলে নতুন জায়গায় এসে সংসারের অনেক কাজই করতে হয় বালক প্রমোদ দাশগুপ্তকে। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ছোট-ছোট ভাইবোনদের তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে তবে তিনি যেতে পারেন ইস্কুলে।

পরাধীন ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিষম দাপট। প্রমোদ দাশগুপ্তের বাল্যকালেই স্বাধীনতার জন্য দেশজুড়ে শুরু হয় প্রবল অসহযোগ আন্দোলন। বাড়িতেও পড়ে তার বিরাট প্রভাব। পরিবারের সবাই চরকা কাটেন। এমনকি সরকারী চাকুরে ডাঃ মতিলাল দাশগুপ্তও বাদ যান না, খদ্দরও পরেন তিনি। স্কুলের ছাত্র প্রমোদ দাশগুপ্তও চরকা কাটেন আর যোগদান করতে থাকেন সভাসমিতিতে।

১৯২৫ সালে বাবা বরিশালে বদলি হলে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় বরিশালের জনপ্রিয় নেতা শরৎ ঘোষের বিশেষ প্রভাব পড়ে তাঁর উপর। শরৎ ঘোষের বক্তৃতা ও সহজসরল অনাড়ম্বর জীবন তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। শৈশবে অনাবিল দেশপ্রেমের যে বীজ তাঁর মনে উপ্ত হয়েছিল, বাড়ির স্বদেশী আবহাওয়ায় ও দেশের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে তা অংকুরিত হয়ে অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। দেশকে স্বাধীন করার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কৈশোরেই টেনে আনে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে।

বিপ্লববাদী বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলনের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন এবং অনুশীলন পার্টির গুপ্ত কাজকর্মের সংগে যুক্ত হন ১৯২৪-২৫ সালে। পরবর্তীকালের অন্যতম প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ও তৎকালীন অনুশীলন পার্টির নিরঞ্জন সেন ও আরও অনেক নেতার সংস্পর্শে আসেন তিনি সংগঠনের কাজের মধ্য দিয়ে। এমনি করে নতুন পথে কৈশোরে সেই যে শুরু হলো তাঁর জীবন-পরিক্রমা, তা থেকে তিনি আর পেছনে ফেরেন নি, শান্ত নিরুপদ্রব গার্হস্থ্য জীবনের প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারেনি মানবমুক্তির দুশ্চর তপস্যা থেকে।

১৯২৮ সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং বাবার নির্দেশমতো কলকাতায় এসে ভর্তি হন ক্যালকাটা টেক্‌নিক্যাল স্কুলে। ইতিমধ্যে অনুশীলন পার্টির তরুণ নেতা নিরঞ্জন সেন আগেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিনা বিচারে আটক রাখার কুখ্যাত কালা কানুনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বন্দীদশা থেকে তিনি মুক্তি পান এই ১৯২৮ সালে এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত ও অন্য কয়েকজন তরুণকে নিয়ে নতুন করে আবার অনুশীলন পার্টি ও বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নামেন।

এর কিছুকাল পরেই ব্রিটিশ সরকার শুরু করলো মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। নিরঞ্জন সেন সমেত আরো অনেক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। প্রমোদ দাশগুপ্ত কিন্তু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পার্টি-সংগঠনের কাজ করে চললেন গোপনে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়ায় সাদা পোশাকের পুলিস তাঁকে ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করলো।

এবার শুরু হয় বিনা বিচারে আটক দীর্ঘ বন্দীজীবন। জেল থেকে জেলে, বন্দীশিবির থেকে বন্দীশিবিরে আটক, তারপর অন্তরীণ, এমনিভাবে কেটে যায় তাঁর জীবনের দীর্ঘ প্রায় সাত-সাতটা বছর। কিন্তু বৃথা কাটে নি।

গান্ধীবাদী রাজনীতি প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কৈশোর ও তারুণ্যের দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর কেটেছে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে। আজ যৌবনের দোরগোড়ায় পৌঁছে পেছনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই মতবাদের যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য সম্পর্কে তাঁর মনে জাগে নানা সংশয়, গুরুতর সব প্রশ্ন। সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদ বা ব্যক্তিগত বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বৃটিশ আধিপত্যের অবসান ঘটানো কিভাবে সম্ভব? আর দেশের যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়, তা কাদের স্বাধীনতা? নির্বিচার শোষণ ও বঞ্চনার শিকার যে কৃষক, শ্রমিক তথা শ্রমজীবী জনসাধারণ, দেশের যারা শতকরা

নব্বই-পঁচানব্বই জন, তাদের স্বাধীনতা কোথায়? তাদের মুক্তির কথা, তার জন্য নির্দিষ্ট কার্যকরী কর্মপন্থার হদিস তো কোথাও নেই, ইত্যাকার গুরুতর নানা প্রশ্নে যুবক প্রমোদ দাশগুপ্তের মন তখন অশান্ত তোলপাড়। পথ খোঁজেন তিনি।

জেলখানায় এই যখন মনের টালমাটাল অবস্থা, তখন ঘটলো মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। শুরু হলো পড়া-শুনো। তিনি দেখলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা কিভাবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী তথা ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা ধ্বংস করা যায় এবং সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়, এ হলো তারই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কর্মপন্থা বা কর্মকৌশল।

পড়তে পড়তে তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারেই যে যুগে যুগে সমাজ গড়ে উঠেছে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস যে শুধু ধারাবাহিক শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হন তিনি। মার্কসীয় দর্শনের আলোয় তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানবসমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির রূপরেখা। তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সাধারণ দর্শন নয়, এ হলো বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দর্শন। এ দর্শনের দুটো অংশ—তত্ত্ব ও কর্মপন্থা। দুটোই সমান অপরিহার্য। তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যেমন একান্ত দরকার, তেমনি তা দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার পন্থা বা পদ্ধতি বা কৌশলও পুরোপুরি আয়ত্ত করা সর্বতোভাবে প্রয়োজন। আর সেইভাবেই গড়ে তুলতে হয় শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন, সংগ্রাম আর শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন।

এ এক অত্যাশ্চর্য জ্ঞানের রাজ্য। এই জ্ঞানের আলোকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি দেখেন ও বিচার করেন সবকিছু এবং আপন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করেন প্রতিটি বিষয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে পুরোপুরি বিজ্ঞান, কোন আপ্তবাক্য নয়, না বুঝে মুখস্থ করার বস্তুও নয়, তা তিনি উপলব্ধি করেন। এই মতবাদের তত্ত্ব ও কর্মপন্থাকে ঠিকমতো বোঝা ও আত্মস্থ করা এবং বাস্তব অবস্থার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ও রূপ দেওয়াই একজন কমিউনিস্টের কাজ। তাই সত্যিকার কমিউনিস্ট হওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নিরন্তর পড়াশুনো, কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে তাকে যেমন বিপ্লবের স্বার্থে কাজ করে যেতে হবে, তেমনি এই বিপ্লবী মতবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও তাকে খর দৃষ্টি রাখতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। উপরন্তু আদর্শ-নিষ্ঠায়, ত্যাগস্বীকারে, নিয়মশৃংখলাপালনে ও স্বভাবচরিত্রে তাকে হতে হবে সবার আদর্শস্থানীয়। এমনিভাবে সেই যৌবনে জেলখানাতেই শুরু হয় প্রমোদ দাশগুপ্তের সাচ্চা কমিউনিস্ট হবার নিরলস সাধনা।

দীর্ঘ প্রায় সাত বছর পরে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান তিনি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ বেআইনী। অতি ছোট পার্টি, সভ্য-সংখ্যাও তেমন কিছু নয়। গোপনে প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখা করেন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থপতি ও পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে এবং তাঁর নির্দেশে ডকের শ্রমিকদের আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেইসঙ্গে অবশ্য চলতে থাকে পড়াশোনা ও শরীরচর্চা আর খাঁটী কমিউনিস্ট হবার একাগ্র প্রয়াস। এ কাজ তিনি জীবনভোর আগাগোড়া চালিয়ে গেছেন, এবং তাঁর কর্মধারা ও জীবনচর্যা থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, এ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল তাঁর সবকিছু, একমাত্র আকর্ষণ আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদই ছিল চিরভাস্বর একমাত্র পথপ্রদর্শক।

১৯৩৮ সালের ১লা মে তিনি পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। এ সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কোন একটা বিশেষ দলের পার্টি ছিল না, ছিল দেশের স্বাধীনতাকামী সমস্ত দল ও ব্যক্তির সাধারণ রাজনৈতিক কাজের মঞ্চ। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন যেমন ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছেন, তেমনি কাজ করছেন মধ্য কলকাতা কংগ্রেসেও। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার অন্যতম কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেধে গেল সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ দেশে ভারতরক্ষা আইন জারী করলো ব্রিটিশ সরকার। সরোজ মুখোপাধ্যায় তখন কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে তিনি আত্মগোপন করেন এবং গোপন কেন্দ্র থেকে পার্টির কাজ চালাতে থাকেন। এইসময় প্রমোদ দাশগুপ্তের ওপর এসে পড়ে নতুন দায়িত্ব। প্রকাশ্যে তিনি জেলা কমিটির কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু বেশী দিন নয়। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন তিনি। অবার শুরু হয় বন্দীজীবন।

এদিকে কিছুকাল পরেই বিশ্বযুদ্ধের মোড় হঠাৎ ঘুরে গেল। অক্ষশক্তির প্রধানতম নায়ক নাৎসী ডিক্টেটর হিটলারের জার্মানী আক্রমণ করে বসলো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রকে। তার ফলে মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান শরিক হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। এই অবস্থায় ১৯৪২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে প্রত্যাহৃত হয় ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা। অন্যান্য কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত মুক্তি পান বন্দীদশা থেকে।

তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' বের হচ্ছে। তার প্রকাশনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। দেশজুড়ে তখন তীব্র কমিউনিস্টবিরোধী হাওয়া বইছে। তারই মধ্যে পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার হিসাবে তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'জনযুদ্ধ'-এর প্রচার-সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সতেরো হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৫ সালের শেষে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'স্বাধীনতা'। তারও ম্যানেজার বা কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্তের সাংগঠনিক ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল

পরে ডেকার্স লেনে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্টির নিজস্ব প্রেস। এই প্রেস গড়ার ও সংগঠিত করার পেছনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্তের অবদান ছিল অসাধারণ। তাঁর তখন দেখার মতো বলিষ্ঠ নিটোল স্বাস্থ্য, মনে অফুরন্ত কর্মোদ্দীপনা। স্নান-খাওয়া ও ঘুমানোর একান্ত প্রয়োজনীয় সময়টুকু ছাড়া পার্টির দায়িত্বপালন ও মঙ্গলসাধনই হলো তাঁর সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞানস্বপ্ন।

১৯৪৭ সাল এল। দেশ-বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটো দেশ জন্ম নিল ও স্বাধীনতা লাভ করলো। সেই বছরই কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন হয় এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

এর কিছু দিন পরেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে দেখা দিল ঘোরতর দুর্দিন। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। সে কংগ্রেসে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বি. টি. রণদিভে। উপরন্তু সেখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা ছিল যেমন বিপজ্জনক তেমনি ক্ষতিকর। তার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে অচিরে মাথা চাড়া দেয় বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী হটকারী লাইন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে যুগে যুগে বারবার দুটো বিষাক্ত বিপজ্জনক ধারা আত্মপ্রকাশ করেছে। তার একটি হলো শোধনবাদী ধারা বা সংশোধনবাদ, অন্যটি হলো অতি-বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী হটকারী ধারা বা পথ। উভয়েরই কাজ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করা, তার বিজ্ঞানভিত্তিক বৈপ্লবিক সত্তাকে নিষ্প্রভ ও নষ্ট করা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে হীনবল ও সম্ভব হলে ধ্বংস করে ফেলা। সারা বিশ্ব জুড়ে তাই কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার সংগ্রাম চলে আসছে যুগ যুগ ধরে এবং আজও চলছে। আমাদের দেশ ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

যাই হোক, হটকারী লাইন চালু হতেই দেখা দিল তার বিষময় ফল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলো। শুরু হলো লাঠিচার্জ, গুলি, ধরপাকড়। পার্টির সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হলো, অফিসে ও প্রেসে সরকারী তালা ঝুললো। পার্টির নেতাদের নামে জারী হলো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। অনেক পার্টি-নেতা আত্মগোপন করলেন। অদ্ভুত কৌশলে পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে আত্মগোপন করলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং গোপন কেন্দ্র থেকে বের করতে লাগলেন সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'।

কিছুকাল পর থেকেই কিন্তু এই হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে সন্দেহ ও সংশয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালে তা আন্তঃপার্টি বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। শুরু হলো তুমুল বিতর্কের ঝড়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বিশুদ্ধতা রক্ষায় এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অতি-বামপন্থী হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে সেই আন্তঃপার্টি সংগ্রামে প্রমোদ দাশগুপ্তের তৎকালীন ভূমিকা ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু এই সংগ্রাম—পরিচালনাকালেই ১৯৫০ সালে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। ১৯৫১ সালে ছাড়া পেয়ে আবার 'স্বাধীনতা' পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের যখন ব্যবস্থা করছেন, তখন অল্প দিনের মধ্যেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। এবার মুক্তিলাভ করতে সেই ১৯৫২ সাল।

১৯৫৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে রাজ্য কমিটিতে এবং সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন প্রমোদ দাশগুপ্ত। এবার পার্টির জীবনে শুরু হয় তাঁর নতুন ভূমিকা। পার্টির সংগঠক রূপে, তাকে শক্তিশালী বড় পার্টিতে পরিণত করার কাজে নামলেন তিনি। এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর এই ভূমিকা যে কত বড় আশীর্বাদ হিসাবে এসেছিল, তা আজ সবাই প্রত্যক্ষ করছে। পশ্চিমবাংলায় আজ আমরা যে সুবিশাল সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সংক্ষেপে সি. পি. আই. (এম)-কে দেখতে পাচ্ছি, তা তাঁর এই ভূমিকারই ফল।

রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হবার পর থেকেই তিনি জেলায় জেলায় সফর শুরু করেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দরুণ অশক্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে এ কাজ তিনি নিয়মিত বারবার করে গেছেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। জেলার পার্টি-কর্মী, দরদী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল সহজ, সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। কথায় কথায় মার্কসবাদী বুলি কপচানো এবং পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অন্যদের তাক লাগিয়ে দেবার ছলাকলা ছিল প্রমোদ দাশগুপ্তের একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। ওসব কলাকৌশল তিনি জানতেনও না, বুঝতেনও না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিভাবে বাস্তব অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করে নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করতে হয় এবং এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয়, তারই তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে। এ আদর্শ তাই তাঁর কাছে আপ্তবাক্য ছিল না, ছিল সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পথ-নির্দেশক।

বারবার এইসব সফরের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর স্থাপিত হয় অতি গভীর নাড়ীর যোগ। দেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল থাকতেন সবসময়। তার ফলে পার্টির ও তার গণ-সংগঠনগুলির কাজকর্মের পরিচালনায় এবং প্রয়োজনমতো সেসবে কৌশলগত পরিবর্তন-সাধনে বারবার পাওয়া গেছে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়। মূল আদর্শ ও নীতির সঙ্গে তিনি কখনই আপস করেন নি, করতে পারতেনও না। কিন্তু অবস্থানুসারে নমনীয় কৌশল-গ্রহণে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরও বিপাকে ফেলেছে বারবার। পার্টি-কর্মী ও শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে গভীর যোগাযোগই ছিল তাঁর এই ক্ষমতার অন্যতম মূল উৎস।

১৯৬০ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার পর থেকে তাঁরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে কৃষকদের জমি-সমস্যা ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয় সারা পশ্চিম-

বাংলার গ্রামাঞ্চল জুড়ে। তার ফলে কৃষক সভা আজ প্রচণ্ড শক্তিশালী, ৪৬ লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে তার সভ্যসংখ্যা।

ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আবার নতুন এক বিপদ দেখা দিয়েছে। এবার বামপন্থী হটকারী ধারা নয়, সংশোধনবাদী ধারা পার্টিতে প্রাধান্য বিস্তার করছে। যেসব কমিউনিস্ট নেতা তখন সংশোধনবাদবিরোধী লড়াইয়ের পুরোভাগে, প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

১৯৬০ সাল নাগাদ ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্য গুরুতর আকার ধারণ করে। সংশোধনবাদী নেতৃত্ব তখন উগ্র জাতীয়তাবাদীরূপে চীনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। আর সংশোধনবাদবিরোধী অংশ চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের বিরোধী। তাঁরা চান, দু দেশের মধ্যে আপস-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা হোক। এই অবস্থায় ১৯৬২ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে সশস্ত্র সীমান্ত-সংঘর্ষ শুরু হতেই পার্টির সংশোধনবাদবিরোধী অংশের ওপর নেমে এল নেহরু-সরকারের আক্রমণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত সমেত প্রথম সারির প্রায় সব পার্টি নেতা ও শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। পার্টির কাজ অবশ্য চলতে লাগলো, তবে গোপনে। সরকারের এই আক্রমণ আসবে, এটা আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়ে দূরদর্শী বিপ্লবী নায়ক প্রমোদ দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে পার্টির গোপন সংগঠন তৈরি করে ফেলেছেন।

১৯৬৩ সালের শেষ থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি নাগাদ অন্যান্য পার্টি-নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্তও ছাড়া পেলেন জেল থেকে। এর পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরোধ চরমে উঠলো। পার্টির সর্বোচ্চ সংগঠন জাতীয় পরিষদে তখন সংশোধনবাদীদের প্রাধান্য। তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদের সভায় যে ৩২ জন কমিউনিস্ট নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের জোরে তাঁদের সাস্‌পেন্ড্‌ করা হলো। এর পর ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে সংশোধনবাদবিরোধী অংশের উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস। কিন্তু তার আগেই প্রমোদ দাশগুপ্ত সমেত পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সব পার্টি নেতাদের অনেককেই আবার বিনা বিচারে আটক করা হলো। এই কংগ্রেসে পার্টির সর্বোচ্চ পরিচালক সংগঠন পলিটব্যুরোতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বসু। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিরও সম্পাদক রইলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি বন্দীদশা থেকে সর্বশেষ মুক্তি পান মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত। বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদবিরোধী অংশের নাম তখন হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সংক্ষেপে সি. পি. আই. (এম)।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ সাল, এই দশটা বছর পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দশক—যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ঘটনাবহুল। এই সময়েই পাওয়া যায় প্রমোদ দাশগুপ্তের সাংগঠনিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। শহরে গ্রামে গঞ্জে কলকারখানায় অফিসআদালতে ও খেতখামারে এই সময় অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে সি. পি. আই. (এম)-এর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা। একদিকে যেমন সে লাভ করে জনসাধারণের অকৃত্রিম সমর্থন ও ভালবাসা, অন্যদিকে তেমনি শত্রুপক্ষের হিংস্র ভয়াল আক্রমণে তার পথ হয়ে ওঠে কঠিন, দুর্গম ও বন্ধুর।

এ দশকেরই গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গঠিত হয় অকংগ্রেসী সরকার—প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। সি. পি. আই. (এম) তাতে যোগ দেয়। কিন্তু দুবারই সে সরকারের পতন ঘটে। তারপর ১৯৭১ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সি. পি. আই. (এম)। কিন্তু ১৯৭২ সালে এক নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কায়েম হয় কংগ্রেসী সরকার। ইতিমধ্যে নকশালপন্থীদের নৃশংস আক্রমণ শুরু হয়েছে সি. পি. আই. (এম)-এর ওপর। অন্য দিকে চলছে হিংস্র কংগ্রেসী হামলা। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকার দেশে জারী করে জরুরী অবস্থা।

এই গোটা দশক ধরে সুদিনে দুর্দিনে, সম্পদে বিপদে সুস্থির নিষ্কম্প হাতে পার্টির হাল ধরে থাকেন যে অকুতোভয় সুদক্ষ কাণ্ডারী, তিনি হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। জনসাধারণের ওপর অটল আস্থা রেখে স্থির লক্ষ্যে তিনি পরিচালনা করেন পার্টিকে। তাঁর নির্ভুল নেতৃত্বে ইস্পাতের মতো দৃঢ়তা নিয়ে অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করে সি. পি. আই. (এম), অন্য দিকে শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে বজায় রেখে চলে ঘনিষ্ঠ নিবিড় সম্পর্ক।

তারপর শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে এল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সি. পি. আই. (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট লাভ করলো সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। একা সি. পি. আই. (এম)ই হলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনেও যে রয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্তের অসামান্য নেতৃত্ব, তা বোধহয় বলার দরকার করে না। ১৯৮২ সালের নির্বাচনেও সেই একই ইতিহাস। বামফ্রন্ট গঠনে এবং চেয়ারম্যান হিসাবে তার পরিচালনাতেও তিনি যে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ক্ষুরধার বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা কখনই ভুলবার নয়।

সুদীর্ঘ ৫৫/৫৬ বছরের কর্মময় সার্থক রাজনৈতিক জীবনের শেষে ৭৩ বছর বয়সে এই সর্বত্যাগী অকৃতদার বিপ্লবী জননায়কের তিরোধান ঘটলো। পেছনে রেখে গেলেন তিনি এক বিপুল কীর্তি-ভাণ্ডার।

প্রমোদ দাশগুপ্ত, এই নামটি কি পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে? না, অবিস্মরণীয় এ নাম—অক্ষয় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে তা ইতিহাসে আর তাঁর সহকর্মী, সহযোদ্ধা, পার্টিকর্মী, দরদী এবং শ্রমজীবী মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়। তাঁর জীবন ও আদর্শ অনির্বাণ আলোকবর্তিকার মতো তাদের পথ দেখাবে প্রতিদিনের কর্মধারায় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংগ্রামে।

তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস জেনো। ইতি—

চিরশুভার্থী

তোমাদের **সম্পাদক বন্ধু**

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

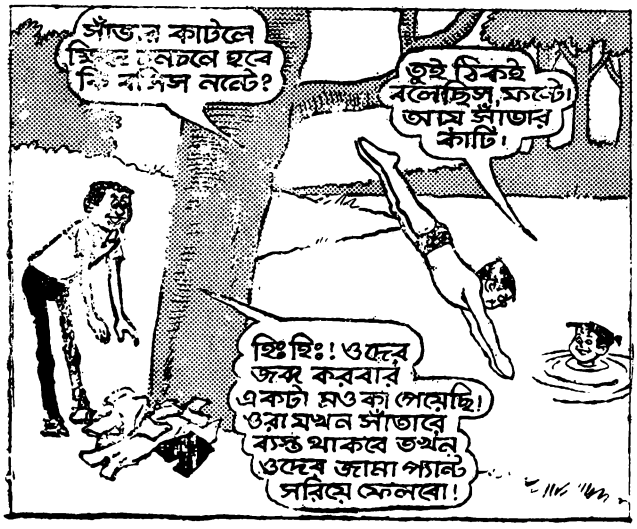

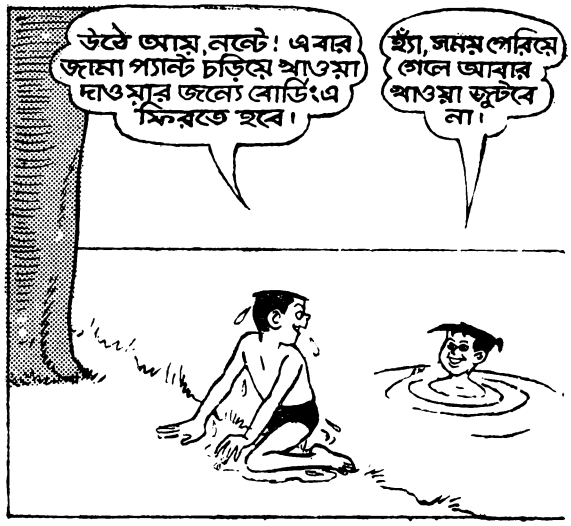

[ক্রমশঃ]

অশোককুমার
সেনগুপ্ত

আপনজন

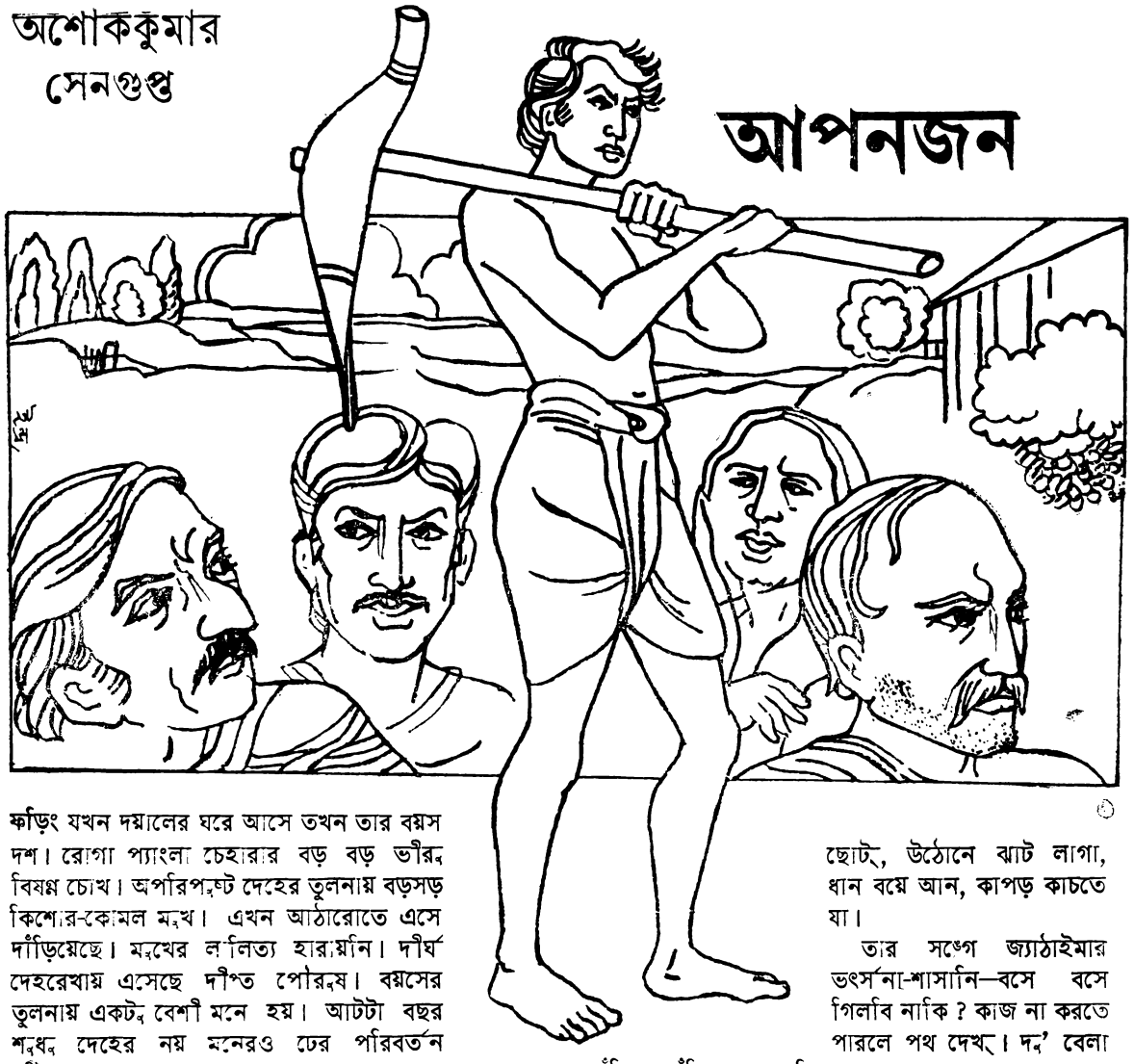

ফড়িং যখন দয়ালের ঘরে আসে তখন তার বয়স দশ। রোগা প্যাংলা চেহারার বড় বড় ভীরু বিষণ্ণ চোখ। অপরিপুষ্ট দেহের তুলনায় বড়সড় কিশোর-কোমল মুখ। এখন আঠারোতে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের লালিত্য হারায়নি। দীর্ঘ দেহরেখায় এসেছে দীপ্ত পৌরুষ। বয়সের তুলনায় একটু বেশী মনে হয়। আটটা বছর শুধু দেহের নয় মনেরও ঢের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ফড়িং জেনেছে, পৃথিবীটা কেবলই যন্ত্রণা নয়। বেঁচে থাকার মধ্যেও মাধুর্য আছে। জেনেছে অত্যাচার শুধু নয়, আদরও পাওয়া যায়। জেনেছে পৃথিবীতে সবাই রামুজ্যাঠা নয়, জেঠিমা নয়, বিনোদ নয়। সব থেকে বড় কথা তার বেঁচে থাকা, তার অস্তিত্বেরও একটা মূল্য আছে।

বাবা মারা যায় ছ' বছর বয়সে। তার আগের বছর মা। অস্পষ্ট, ধূসর বাবা মায়ের স্মৃতি। মুখও মনে পড়ে না। কেমন যেন এলো মেলো হয়ে যায় সবকিছু। তারপর চারটি বছরে সে যে জীবনকে দেখেছে সে বড় কঠিন, নির্মম। ভারবাহী জন্তুর মতো বইতে হয়েছে রাম জ্যাঠার ঘরের ধারাবাহিক আদেশ। গোরু দেখ্, দোকান ছোট্, উঠোনে ঝাট লাগা, ধান বয়ে আন, কাপড় কাচতে যা।

তার সঙ্গে জ্যাঠাইমার ভৎর্সনা-শাসানি—বসে বসে গিলবি নাকি? কাজ না করতে পারলে পথ দেখ্। দু' বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত দিয়ে তোমাকে পোষার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সরে পড়ার জায়গা কোথায় ছিল? অনাত্মীয়ের এই পৃথিবীতে তার জন্য কোথায় ছিল ঘর—আরাম-উষ্ণতা? কাকা নাকি ছিল তার। কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না। কেউ বলতো, কয়লা-খাদে। কেউ বলতো, যুদ্ধে। কেউ বা বলতো, আর কি বেঁচে আছে।

বাবা মারা যাবার পর রামু জ্যাঠা জায়গা না দিলে তাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতো। সেই কৃতজ্ঞতায় কষ্টের জীবনও তাকে সহনীয় করে নিতে হয়েছিল। ওদের ছাড়া তো আপনজন সে কাউকে ভাবতে পারে না। তার মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখতো বড় হয়ে সে এই হরিপুর গাঁ

ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবে। কাজ করবে। বড় হলে সে নিশ্চয়ই কাজ করতে পারবে।

তবে রামজ্যাঠার ঘরে সবটাই যন্ত্রণা ছিল না। উপহার একটা ছিল। সে উপহার আলতা, রামজ্যাঠার মেয়ে। ফ্রকপরা একমাথা চুল ক্ষীণা শ্যামলা বালিকা। ও স্পষ্ট দেখতে পেতো তারজন্য কষ্টে মেয়ের মুখে কেমন দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। মাকে বলতো, ওমা, তুমি আমাদিকে মিষ্টি দিলে, ফড়িং দাকে দিলে না কেন? বলতো, দাদাকে বকো না শুধু ফড়িং দাকে বকো কেন? বলতো, ফড়িংদাকে স্কুলে যেতে দাও না কেন?

উত্তরে জেঠিমার ছিল একটাই কথা, ছোটো মুখে বড়ো কথা বলো না।

তার কাছেও বলতো আলতা, চুপ করে বসে থাকবে। অত খাটো কেন তুমি! জ্বরের সময় ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে বিছানার পাশে বসে থাকতো। ডাক্তার, ওষুধের জন্য ঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড করতো। অথচ জেঠিমার মতো সেও ভাবতো এমনি অসুখ সেরে যাবে।

ঐভাবেই বুঝি দিন চলতো, কিন্তু একটা ঘটনা সম্পূর্ণ বদলে দিল জীবনটা। রামজ্যাঠার ছেলে বিনোদের সঙ্গে গুলি নিয়ে ঝগড়া হলো। তার থেকে হাতাহাতি। খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু জেঠিমা সেই-নিয়েই কাণ্ড বাধালেন। রামজ্যাঠার আবার সেইদিনই পুকুরের মাছ ভাগ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে অন্য শরিক ঘোষদের সঙ্গে। ব্যস্, ঘরে এসে শোনামাত্র শুধু কথা নয়, হাতও চললো এলোপাথাড়ি। মারতে মারতে ঘর থেকে বাইরে। রাস্তায় একেবারে। আশপাশ মানুষজন দর্শক মাত্র। নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে ফড়িং। প্রতিবাদ নেই। আর্তনাদ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মানুষটার হাতের কঞ্চির ঝাপট সয়ে যাচ্ছে। এই সময়—হঠাৎ দেখা গেল ছুটে আসছে একটি লোক।

লোকটির গায়ে হাফসার্ট, মালকোঁচা ধুতি। বেঁটে খাট শ্যামলা শক্ত পুরুষ। বগলে ছাতা। মাথায় টাক। হা হা করে ছুটে এলো। শুধু ছুটে আসা নয়, রামজ্যাঠার হাত থেকে কঞ্চিও কেড়ে নিল। বললো,—করেন কি মশাই, বলি হয়েছে ট কি? আহা দুধের ছেলেকে এমনি করে পিটুছেন কেনে?

রামজ্যাঠা রাগে উত্তেজনায় তখনও গমগমে আগুন। বললো,—ছিপটি কাড়লেন মানে? বটেন কে আপনি? আপনার এত দরদ কীসের লেগে মশাই? আঁ, নিজের ছেলে মারবো তাতে কার কি?

লোকটি বিনীতকণ্ঠে বললো, আমি দয়াল মণ্ডল। চাষ করে খাই। তা মারুন নিজের ছেলেকে। একটু কম করুন। মরে যাবে যে।

মরে মরবে,—রামজ্যাঠা দাপাতে লাগলো: অমুন ছেলে গেলে বাঁচি। বাপ-মা খেয়ে আমার সংসারে জ্বালাতে এসেছে।

—তাহলে আপনার নিজের ছেলে লয়?

—না মশাই। এমুন হতভাগা ছেলে আমার হবেক কিসের লেগে?

—তা বলতে হয়। তারি লেগে এমুন গোরু-পেটা করতে পারলেন। নিজের হলে গর্জনটিই বেশী হতো। মার তেমুন হতো না। দেখেই তাই মুনে সন্দ ছিল। ছিপটির যা জোর, ই নিজের লয়। হেঁ হেঁ দুনিয়ারই এ নিয়ম। বলে মিটি মিটি হাসতে লাগলো দয়াল মণ্ডল।

আপনার এত ফপর দালালিতে কাজ কি মশাই? খেতে পরতে দেন? দিলে বুঝতে পারতেন।—মাথা ঝাঁকিয়ে রামজ্যাঠা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যোগ করলো: যান কেনে ঘরে লিয়ে, যখন অত দরদ।

—যাব লিয়ে? আঁ, আপনি বলছেন দিয়ে দেবেন? তা মুন্দ নয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যান, হাড় জুড়োয় আমার।

চ' রে ছেলে। এসেছিলাম্ কুটুম ঘরে তুকে পেলম।—বলেই হাত ধরলো সেই দয়াল কাকা: ওঠ বাপ। তা দেখছি পিটুনি খেয়ে গোরু হয়ে গেইছিস্। মারেও রা নাই।

রাম জ্যাঠা তাজ্জব। তাজ্জব অবশ্য ফড়িং-ও কম নয়। পাশে দর্শনার্থীরাও। তারা তখন খোঁজ নিচ্ছে দয়াল মণ্ডলের। আর দয়াল কাকা বলছে,—নিতান্তই গরীব মশাই আমি। এসেছিলম মামাতো বুনের ঘরে। আপনাদের গাঁয়েই রইছে বোন। জামাই-এর নাম হারাধন। তা ফিরবার পথে একে পেলম্। নিয়ে যাব। তাহলে চলি——কি বলেন? হেঁচকা টানে তাকে তুলে দয়াল কাকা বললো,—কি রে যাবি তো?

রামজ্যাঠার উত্তেজনা তখনও কমেনি। বললো,—যাবে না মানে? ওকে কি আর ঘরে ঢুকতে দেব নাকি?

আলতা শুধু একবার বলেছিল,—ও বাবা, ফড়িং দাকে যেতে দিও না। কান্নার সঙ্গে ছুটে এসে হাত ধরেছিল। বলেছিল,—ফড়িং দা গো তুমি যেও না। বাবা তুমাকে আর মারবেক নাই। ও ফড়িং দা তুমার পায়ে পড়ি। রামজ্যাঠা মেয়েকে হিঁচড়ে টেনে সরিয়েছিল।

কার্তিকপুরে দয়াল কাকার ঘরে এসে তার মনে হয়নি গলগ্রহ সে। মনে হয়নি সে বাইরে থেকে এসেছে, এ বাড়ির ছেলে নয়। রাস্তায় তাকে মিষ্টি খাইয়েছিল দয়াল কাকা। দোকান থেকে জামা কিনে পরিয়েছিল। বলেছিল হাতে তো বেশী টাকা নাই, জামাপ্যান্ট দু' জোড়া কিনে দেব এখন। ঘরে ছিল কাকীমা। না কাকীমা নয়—মা। শ্যামলা গোলগাল মহিলাটি সব শুনে বলেছিল,—ওমা যাবো কোথা। এমন মিষ্টি মুখের ছেলেকে মারতে হাত উঠেছেক্। বস্ বাবা বস্। হ্যাঁগো ছেলেকে খাইয়েছ তো? পরে বলেছে,—উহুঁ, আমি কাকীমা লই, তুমি কাকা হও গা—আমি মা। মিষ্টি মুখে সে যে কী মধুর হাসি।

দয়াল কাকা বড়োলোক নয়। নিজের জমি নেই। চাষ করে পরের জমি। খড়ের চাল। মাটির ঘর। একজোড়া

বলদ, একটা গাইগোরু। ছেলেমেয়ে নেই। গোরু-গাড়ীটা মালপত্র কিংবা লোক বইবার জন্য ভাড়া খাটায়। পরের জমি বার বিঘে চষে দু'টি মানুষের ধান চাল হয়ে যায় সম্বৎসরের। তবে ভারী দিলখোলা মানুষ। নিজের জমানো বলতে কিছুই নেই। পরের দুঃখ শুনলে গলে কাদা। কোঁচড়ের পয়সা বের করে দেয়। বলে,—আহা, ভগবান আমার গায়ে বল দিয়েছে—খেটে খাব। যাক ক'টা টাকা। গাঁয়ের ক্লাব, যাত্রা, থিয়েটারেও মোটা চাঁদা দেয়। কথায় কথায় হাসিও লেগে থাকে। আর পরের ব্যাপারে নাক গলান স্বভাবও কম নয়। নায্য কথা অবশ্য বলে। কিন্তু ন্যায্য কথাও তো সময় সময় গোল বাধায়। মা বললেও শোনে না। মায়ের কথা, গাঁয়ে তো আরো লোক রয়েছে তোমার কি? দয়াল কাকা মাথা চুলকায়। এমন মুখ করে তাকায় যেন খুবই গর্হিত কাজ হয়ে গিয়েছে।

ফড়িং-এর কাকার এই স্বভাব, 'দোষ' বলে মনে হয় না। এ রকম স্বভাব না হলে তো তার এখানে আসাই হতো না। রামজ্যাঠার ঘরে অজস্র ঝামেলার জোয়াল, ভৎর্সনা আর পীড়ন নিয়েই কাটাতে হত। এখানেও কাজ কম নেই। তবু এ কাজ করার মধ্যে সে একটুও কষ্ট টের পায় না। লেখাপড়া তো রামজ্যাঠার ঘরে কিছুই হয়নি। এখানে মা তাকে শিখিয়ে যাচ্ছে। স্কুলে যেতে দেয়নি। রোজ সন্ধ্যেবেলায় মা শেখাতেন অ আ ক—খ—একে চন্দ্র—দুয়ে পক্ষ। এই শিক্ষাই তাকে হিসাব-পত্র, চিঠিপত্র লেখা পড়ায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হতে দেয়নি। দয়াল কাকা তাকে শিখিয়েছে চাষের কাজ। আগ্রহ তার পড়াশুনোর চেয়ে এদিকেই বেশী। নইলে মা, হোক না সে বড়, স্কুলে পাঠানোর জেদ নিয়েছিল।

দয়ালকাকার চেয়ে কাজ এখন সে-ই বেশী করে। চাষের কাজ তো বটেই। ঘরেরও। ভারী খুশী দয়াল। বলে,—না বৌ, বেটা আমার কাজের বটে। আমি ভাবতম্ খাটুনিতে আমার জোড়া কেউ নেই। উহুঁ, এখন দেখি ফড়িং-এর জোড়া পাওয়াই ভার। আমার ডবল ধান কাটে। লাঙল পাড়াতেও দুনো।

মা বলে,—ছুটু ছেলে বেশী খাটাবে না।

—বটেই তো। আমি জানি না নাকি? কত আর বয়স। তবে ঐ যে ফড়িং ও যে মানে না। বলে, তুমি জিরেন নাও।

—আর অমনি তুমি বসে যাও তো?

—মাথা খারাপ, তাই বসি। আমিও করি।

ফড়িং হাসে। বলে,—আমার লেগে তুমাদের ভাবনা নাই। এই দেখ আমার হাতের গুলি। দাব না। এই দেখ বুকের পাটা।

মা হাসে। দয়ালও। মা বলে,—শরীরের বড়াই করতে নাই। কি এমুন শরীর। আর চাট্টি বেশী খেলে গায়ে গতরে লাগত।

পাড়ার লোকে বলে, দয়ালের ভাগ্য বটে। কুড়োনো ছেলে নিজের ছেলেরও বেশি।

দয়াল এখন নিজের বুদ্ধির উপর তেমন ভরসা রাখে না। ফড়িংয়ের বুদ্ধি নেয়। বলদ জোড়া বদলে অন্য বলদ নেওয়া, কি কোন্ ক্ষেতে কি ধান বুনবে তা জানা, কি কাউকে কিছু দেওয়া—সবেই ফড়িং যা বলবে তাই।

এভাবেই বয়ে যাওয়া দিন আচমকা বাঁক নিয়ে বসলো। আমগাছে উঠতে আছাড় খেল দয়াল। কম চোট নয়। হাসপাতালে শয্যা নিতে হলো। ঘরে এলো একখানা পা হারিয়ে। শুধু পা হারালো নয়, তার সঙ্গে মনের সাহস, শক্তি, সবই নিঃশেষিত। পা হারানোর শোক ঘরের মধ্যে বিষাদের ছায়া আনলো। উজ্জ্বল দিন-গুলিতে নেমে এলো কালো মেঘের ছায়া। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি হয়ে দয়াল বসে থাকে। পায়ের জন্য হা হুতাশ ছাড়া অন্য শব্দও মুখে নেই।

ফড়িং বলে,—কাকা গো, তোমার অত ভাবনা কিসের? আমি তো রইছি।

—জানি, জানি। যতদিন না মরছি ততদিন আমাকে পুষতে হবেক তুকে।

—কি যে বল তুমি। পোষা কিসের। লাঠি নিয়ে হাঁটতে পারবে। হাতের কাজ করতে পারবে। মনের জোর কর তুমি।

—কোন কাজ করতে পারবো না বাবা।

—এখুন মনে হচ্ছে, গায়ে বল এলে সব পারবে। কিন্তু মনকে কাহিল করলে যে উঠতে পারবে না।

মাও বলে,—অত ভাবনা কিসের। আমাদের ফড়িং রইছে।

—উ চলে যাবে না তো গো?

ফড়িং বলে, না কাকা, তুমার মাথার ঠিক নেই। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে যে চলে যাবো।

—তু'ই তো আমাদের ছেলে লস্।

মা হাউ হাউ করে ওঠে,—কি সর্বনাশে কথা। তোমার কি পায়ের সঙ্গে সবই গেল? ফড়িংকে ও কথা বলতে পারলে।

ফড়িং স্তব্ধ হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ যন্ত্রণা বয়ে চলে শোঁ শোঁ করে। তারপর ধীরে ধীরে বলে,—কাকা, আমি আজও তুমার ছেলে হতে পারলম্ নাই। ভাগ্যটাই এমুন আমার।

মা আকুল হয়ে দুহাতে বুকের দিকে টানে ফড়িং-কে, —তুই আমার ছেলে রে ফড়িং। ও তো তোর কাকা রে।

ফড়িং কাঁদে। মা কাঁদে। বিছানায় দয়ালের চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। দু' হাত বাড়ায় সে ফড়িংয়ের দিকে,—"আয় বাবা বুকের কাছে আয়। পা হারিন আমার মাথার ঠিক নাই। তুকে কি বলে ফেলেছি।

ফড়িং দয়ালের বুকের উপর পড়ে। কান্নায় সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু দয়ালের মন পরিবর্তিত হয় না। কর্মঠ একটা

মানুষের অলস পড়ে থাকা মস্তিষ্কে যে ক্রিয়া ঘটায় তাতে দেহেরও ভাঙ্গন ধরে। আর এর মধ্যেই আবার দুর্যোগ ছোট্ট পরিবারে। মাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামান্য অসুখ ভেবেছিল, কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে বুঝলো, সহজে যাবে না। রোগ বেশ জাঁকিয়ে বসেছে শরীরে। দুটো অসুস্থ মানুষকে নিয়ে ফড়িং বিব্রত হয়। না বিরক্ত নয়, কষ্টও হয় না। শুধু মনে হয়, কি করলে এরা দ্রুত আরোগ্যের পথে যাবে। সেই ব্যস্ততার উত্তেজনা তাকে বড় কষ্ট দেয়। ভাবে ভঙ্গিতে সে বুঝতে দেয় না। এদিকে সারা বছর চালানোর জন্য জমা ধান বিক্রি করতে হয়। ঘরের জমানো দু'শ, আড়াই শ'র মতো টাকাও বেরিয়ে যায় ডাক্তারে ওষুধে। গোরুর গাড়ির ভাড়াও সময় বুঝে হয় না। দুর্ভাগ্য তাকে যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। বুদ্ধি দেবারও কেউ নেই। যাদের কাছে নেবে তারা তো শয্যাশায়ী। শুধু মা বলে,—ফড়িং ঘরের তো সবই শেষ। ইবার কি হবে? হ্যাঁ, বাবা খাব কি? তুই বা কি খাবি?

—সে জন্য ভেবো না মা। আমি আছি।

—বলদ জোড়া বিচে দিবি?

—তাহলে চাষ করবো কিসে, গাড়ীই বা টানবে কে?

—গাইটো বিচে দে। ঘরে পিতল কাঁসা আছে

উগুলাও বেচার ব্যবস্থা কর।

—সে ভাবনা তুমাদের নাই। আমি ধার করে চালাব ধান পাকলে ভাগ পাবো। তখন শোধ হবে। খেটেও শোধ করবো।

ফড়িংয়ের পুরুষ্ট হাতে নিজের শীর্ণ হাত বুলায় মা। বলে,—তু'র শরীর খারাপ হনুছে।

—উ তুমার ভুল। আমি যেমনকার তেমুন আছি।

—নিজে রেঁধে খেছিস্? বললম্ বিনুর মায়ের ঘরে খেতে।

—দরকার কি, নিজে আমি সব পারি মা।

দয়াল খুবই কম কথা বলে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে ঘোরাফেরা করে। ফড়িংকে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করতে উপদেশ দেয়। দাবড়ে দেয় ফড়িং, তখন ছেলেমানুষের মত ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে থাকে দয়াল।

অসুখ থেকে মা উঠলে ভারী আনন্দ হয় ফড়িংয়ের দয়ালও খুশি।

মা বলে,—তুর লেগে বাঁচলম্।

—তা হলে আমি ডাক্তার।

—না তু ডাক্তারের চেয়ে বড় বটিস্। তুই আমার ছেলে। তুই আমার সব চেয়ে বড় ওষুধ রে।

বুক ভরে যায় ফড়িং-য়ের। দেনার জন্য ভাবনা হয় না। এত খরচ, রাত জাগার কষ্ট, আহার না জোটা কিছুই মনে পড়ে না। মাকে সে জড়িয়ে ধরে। সার শরীর যেন নিমেষে স্নিগ্ধ হয়ে যায় তার।

হঠাৎ-ই একদিন হাজির হলো রামুজ্যাঠা। সঙ্গে প্যান্ট সার্ট পরা একটা মানুষ। এই মানুষটি নাকি ফড়িংয়ের কাকা। কয়লা খাদে চাকরী করে। দাদার ছেলেকে মনে পড়েছে এতদিনে। খোঁজ নিতে তাই হরিপুরে গিয়েছিল। তারপর রামুজ্যাঠা নিয়ে এসেছে এখানে। ফড়িং-কে দেখেই কাকা বললো,—একদম দাদার মতো হয়েছে।

রামুজ্যাঠা বললো,—ঠিক বলেছ। ও বাবা ফড়িং. কাকাকে পেন্নাম কর। বুঝলে দিনু, ফড়িংকে আমিই রেখেছিলাম। আহা তখন তো ফড়িং-ই গো। এতটুকু ছেলে। রুগা হাত-পা। নামের মতোই বটে। তা এই লোকটা ভাগিয়ে নিয়ে এলো। বললাম তখন ফড়িংকে. যাস্ না বাবা। আমার কাছে থাক্। আমি তোর নিজের না হলেও জ্যাঠার মতোই। ছেলের মতো থাকবি। লেখা-পড়া শিখবি। এই লোকটা তখন বুঝিয়েছে। ছোট ছেলে ওর ভুলুনিতে ভুলেছে।

এত বড় মিথ্যুককে ফড়িং ঘুষি মেরে থামিয়ে দিত কিন্তু ঘরে এসেছে অতিথি। তাই বললো,—রামু জ্যাঠা চুপ করো।

মানুষটা ফড়িং-এর রক্তিম চোখ দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট বুলিয়ে নেয়। বলে,—করবোই তো বাবা—নিশ্চয়ই করবো। শোন, তোমার কাকার এখন ঢের পয়সা। একটা ছেলে। ছ' মাস আগে সেই ভাই মারা গিয়েছে তোমার

আহা-হা তারপর থেকে কাকা-কাকীমা তোমার মনমরা। কাকা বলছে, বংশের ছেলে, না জানি কোন্ হা-ঘরে পড়ে আছে, নিয়ে এসে কাছে রাখব। কোলিয়ারীতে চাকরী করে দেব। আমার সব কিছুর মালিকই তো দাদার ছেলে। আহা, এমন মানুষ হয় না। আমি বললম্, দিনু তুমি যোগ্য কাজই করবে। চল খোঁজ করে দেখি। তারপর হারাধনের কাছে কার্তিকপুরের খবর নিয়ে কাকাকে আনলাম। চল বাবা নিজের ঘরে। ফড়িং দেখে রামু জ্যাঠার শরীরে বয়সের ভার এসেছে। কিন্তু স্বভাব বদলায়নি। ফড়িং একবার দয়াল কাকার দিকে তাকাল। তারপর মায়ের দিকে। দু'জনেই যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছে।

—কাকা তাহলে আমাকে নিতে এসেছে?

হ্যাঁ, শুনলি কি তাহলে। বিনোদকে ও নিয়ে যাবে না। বিনোদ রে। আমার ছেলে। তোর ভাই। লেখাপড়া তো হলো না।

ফড়িং শোনে না। কাকাকে দেখে। বাবা কি এমনিই ছিল? উহুঁ আরো রোগা। মুখে এমন জৌলুস ছিল না। এ মানুষটার সুচ্ছলতা শ্যামবর্ণ মুখে ছাপ রেখেছে। বড় বড় চোখ। গায়ের জামা, প্যান্ট, জুতো, ঘড়ি সবই উজ্জ্বল।

কাকা বলল,—নে, দেরি করিস না। কিছু শুনবার আমার দরকার নেই। জিনিসপত্রও নিতে হবে না। ধানবাদে কিনে দেব।

ধানবাদ!—ফড়িং অস্ফুট গলায় বললো।

—হ্যাঁ রে বোকা, কাকা তোর ধানবাদে থাকে।

—কতদূর বটে ধানবাদ?

—কত আর, ট্রেনে চড়লে কতক্ষণ লাগে। যাক্ বাবা দেরী করিস না।

ফড়িং বললো,—কিন্তু ঘর ছেড়ে আমি ধানবাদ যাব কেনে?

রামু জ্যাঠা বললো,—ওরে হাঁদারাম, ঘর তো ধানবাদ। বাপের ভাই, আপনজন, পরমাত্মীয়। বলি, বয়স তো হল। এটা বুঝিস না। শুনেছি সব এ ঘরের কথা। দুটোকে নিয়ে কম ঝামেলা তোর! একটা খোঁড়া, একটা রোগেধরা।

—রামু জ্যাঠা, চুপ কর। অনেক বলে ফেলেছ।

বলেছি নাকি?—রামু জ্যাঠা বিড়বিড় করে: ঠিক আছে বাবা, চুপ করছি। নে চল দিকিনি। তোর কাকা অনেক খরচপত্র করে এসেছে।

—তাতে আমার কি।

কাকা বললো,—এদের ছেড়ে যেতে মায়া লাগছে। লাগারই কথা। তবে কিছুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

রামু জ্যাঠা মুখ সামলে রাখতে পারে না। সময় বয়ে যায় দেখে বিরক্ত হয়। বলে,—বেঁচে যাবি রে। জায়গা পাচ্ছিস এই কত।

ফড়িং হাসলো। বললো,—আঠারো বছরের ছেলের জায়গার অভাব হয় না রামুজ্যাঠা। দশ বছরের ছেলের কিন্তু হয়। সেই দশ বছরের ছেলে তো আমি আর নই।

কাকা বললো,—হুঁ, কথা শিখেছিস খুব।

—কি করবো। কেউ তো শেখানোর ছিল না কাকা। তা খাওয়া দাওয়া করবে তো তোমরা। বোস। আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। মায়ের শরীর ভালো নেই। দয়াল কাকার অবস্থা তো দেখছই। খেয়ে দেয়ে যাবে। অতিথি মানুষ, দেখি কি ভাবে মান রাখতে পারি।

—কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি খাবার জন্যে আসিনি। তুই যাবি কিনা? আমি তোর কাকা।

কাকা!—ফড়িং কেমন হাসে: কেমনে জানবো আপনি আমার কাকা কিনা। তবে হ্যাঁ, এই লাঠি নিয়ে লোকটা আমার কাকা। আর এটা আমার মা।

রামুদা চল।—কাকা সদর্পে বেরিয়ে যায়।

ফড়িং শব্দ করে হাসে। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—ও মা রাগ কোরো না। অতিথ মানুষ ফিরিন্ দিলম্ বলে। কি রাগ কর নাই তো? তুমি তো আবার অতিথ মানুষের মান্যি করো।

রাগ নয়। ফড়িং অবাক্ বিস্ময়ে দেখে, পাথরের মূর্তি দুটোতে অপূর্ব, মধুর হাসি ফুটে উঠেছে। যে হাসি সবার চেয়ে দামী।

কত অজানারে

হীরক দাশ

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে, প্রায় একশ' বছর আগেই পৃথিবী থেকে ক্রীতদাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণী জগতে এই প্রথা এখনও চালু আছে! এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে একজাতের লাল পিঁপড়ে আছে যারা ক্রীতদাস রাখে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম 'পলিতার গাস্ রুফেসেন্স্'। এরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল পিঁপড়েদের আস্তানার সন্ধান পেলে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে। ধারালো চোয়ালের সাহায্যে ওই পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলে ওদের ডিম নিয়ে ফিরে আসে বিজয় উল্লাসে। পরে ওই ডিম থেকে যে সব পিঁপড়ে জন্মায় তারা ক্রীতদাসের মতো সারা জীবন অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা করে চলে এই লাল পিঁপড়েদের। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই লাল পিঁপড়েরা যদি ক্রীতদাস না রাখতো তবে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব হতো না। কারণ, এদের বিশেষ আকৃতির ধারালো দুই চোয়ালের সাহায্যে এরা সব কিছু করতে পারে কিন্তু পারে না নিজেদের মুখের ভেতর নিজেরা খাবার প্রবেশ করাতে। ক্রীতদাস পিঁপড়েরা এদের খাইয়ে দেয়। তাই ক্রীতদাস না রাখলে এরা উপোস করেই মারা যেত।

হঠাৎ পাথরের উপর চাপ আলগা হয়ে গেল কেন ?... খাঁড়াদেঁতো কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ?. পাথরটা সরিয়ে দেখি ...
ভীষণ ব্যাপার !
যাঃ ! দুটোই শেষ হয়ে গেল !
অজগরের আলিঙ্গন থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে শূন্যে ঝাঁপ দিল বাঘ ...
24

আগামী সংখ্যায়—"অন্ধকারের শত্রু!"

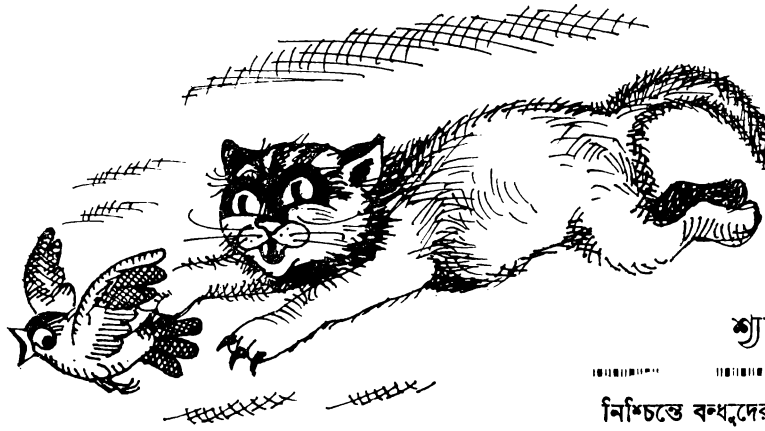

আদুরী

শ্যামাদাস দে

আদুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সম্প্রতি। ওর নামটা আমার দেওয়া নয়, নাম দিয়েছে আমার সাত বছরের নাতনী শ্রীরাধা

নাতনীর এ নামটি অবশ্য আমার দেওয়া। সুস্মিতা, না সুচরিতা, না সুতনুকা—কি যেন একটা ভাল নাম আছে ওর। সে আমার মনেই থাকে না।

নাম ভুলে যাওয়া এবং ভুল নামে ডাকার ব্যাপারে আমাকে সিদ্ধ পুরুষ বলা চলে। এ জন্যে যে কত জনের কাছে কতবার বেকুব বনেছি, লজ্জা পেয়েছি,—তবু এ ব্যাধি আমার দুরারোগ্য।

তাই যাদের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ তাদের সকলকেই একটা করে নিজস্ব নাম দিয়েছি। পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনী এবং তস্য বন্ধুদের আমার দেওয়া নামাবলী কিন্তু আমি ভুলিনা। এ এক রহস্য বটে।

আমার দেওয়া নামগুলি বিচিত্র। যেমন হুতোম, কুমড়ো, উচ্ছে, চিংড়ি মাছ, বোড়ো-তালি (পুত্রদ্বয়), কুলো-ডালা (কন্যাদ্বয়) এক্কা-দোক্কা (নাতনীর সই প্রতিবেশী বন্ধু), ধানাই-পানাই (নাতির একজোড়া বন্ধু) ইত্যাদি। এই নামতালিকার মধ্যে নাতনীর নামটি একটু ব্যতিক্রম। ওর আদি নাম ছিল বিস্কুট। সেই বিস্কুট একদা কি করে শ্রীরাধা হল, সেটাও বলতে হচ্ছে।

কর্মব্যাপদেশে বিদেশে ছিলাম। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে যখন বাড়ি এলাম, তখন ওর বয়স আড়াই বছর। সেই ওকে আমার প্রথম দর্শন এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম। দেখতে দেখতে সে প্রেম এত গাঢ় হল যে, বাবা-মা অথবা অন্যান্য খেলার সঙ্গী সব বরবাদ হয়ে গেল। আমি হলুম ওর এক নম্বর বন্ধু। ওর মা-বাবা ওকে আমার কাছে রেখে নির্ভয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়ায়, নিশ্চিন্তে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়।

চার বছর বয়স পর্যন্ত ওর নাম ছিল 'বিস্কুট'। কারণ আমার কাছে আগমনের ওর তখন একটিই উদ্দেশ্য ছিল। এসেই বলত, বিকুৎ খাব।

বাচ্চাদের জন্য আমার স্টকে সর্বদা কিছু বিস্কুট, লজেন্স, বাদাম ইত্যাদি মজুত রাখতে হয়। দাঁত ওঠার পর থেকে কুট্ কুট্ করে বিস্কুট খাওয়া ওর একটা নেশা দাঁড়িয়ে গেছিল।

সে নেশা কাটার পরে শুরু হয়েছে গল্পের নেশা, এ নেশা সামলাতে আমি একেবারে ঠাণ্ডা। আমার যে কতো কাজের সময় ওর জন্যে অপচয় হয়ে যায় গল্প বানিয়ে বানিয়ে! এখনও চলছে এই নেশা।

একদিন বলেছিলাম,—আর একটা বড় নেশা না ধরা পর্যন্ত তোর এ গল্পের নেশা কাটবে না দেখছি।

—বড় নেশা কি?

—ভালবাসার নেশা।—গম্ভীরভাবে বলি আমি।

—আমি তো তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি। সেটা কি নেশা?

—ও ভালবাসা নয়রে, সে ভালবাসা হল শ্রীরাধার ভালবাসা।

—তাহলে আমি তোমাকে শ্রীরাধার মত ভালবাসব, দাদু।

বহুৎ আচ্ছা, তাহলে তোর নাম দিলাম শ্রীরাধা।—ওকে ডবল চুমু খেয়ে হেসে বলি আমি।

'বিস্কুট' থেকে 'শ্রীরাধায়' উত্তীর্ণ হয়ে নাতনী তো দারুণ খুশী।

শ্রীমতী শ্রীরাধার ভালবাসায় আমি যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন একদিন……

তার আগে আমার অবস্থানটা একটু বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

আমাদের দোতালা বাড়িটার নীচে ৬।৭ খানা ঘরে পুত্র কন্যা নাতি নাতনীরা তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে সারাক্ষণ গুলজার করে থাকে। দোতালায় মাত্র দুখানা ঘর আর রেলিং-ঘেরা মস্ত ছাত। দোতালাটি আমার নিজস্ব। সিঁড়ির মুখে প্রথম ঘরটি আমার লাইব্রেরী, এবং পুব-দক্ষিণ-খোলা অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটিতে আমার লেখাপড়া, শোয়াবসা সব।

দোতালায় আমার সঙ্গে আর যিনি সমানাধিকার দাবী করতে পারতেন, তিনি কয়েক বছর আগেই আমাকে ছেড়ে গেছেন। এখানে তাই আমার অবাধ একাকিত্ব। এ বাড়িতে তাই নীচেটা জমজমাট উপরটা নিঃশব্দ, নিঝুম।

লাইব্রেরী ঘরটাই প্রয়োজনে বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। ও ঘরে সোফাসেট, টেবল, চেয়ার ইত্যাদি আছে। আমার শয়ন তথা পাঠকক্ষে একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া সকলেরই প্রবেশ নিষেধ। এমনকি ছেলেমেয়েরাও সম্মতি না নিয়ে প্রবেশ করে না। শ্রীরাধার কথা অবশ্য আলাদা। ও যে কখন কোন্ মুডে ঢুকে পড়বে এবং আমার মুড নষ্ট করে দেবে, তা স্বয়ং বিধাতাও বলতে পারবে না।

আমার লেখাপড়ার টেবলটি বৃহৎ। এ টেবলে বলতে গেলে একটা ছোটখাট সংসার সাজিয়ে রাখি আমি। এক প্রান্তে আছে আমার চা-কফির সরঞ্জাম। কৌটোয় কৌটোয় রয়েছে চা, কফি, বিস্কুট, চানাচুর, ঘনীভূত দুধ, চিনেবাদাম ইত্যাদি আর এক প্রান্তে রেডিও ফুলদানী ইত্যাদি। সামনের লম্বা ধারটা জুড়ে আছে ২০।২৫ খানা বই। মধ্যিখানে টেবললাম্পসহ আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা।

চেয়ার রাখিনি এ ঘরে। টেবলটি আমার শয্যা-সংলগ্ন। শয্যায় বসে এবং মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়েও চলে আমার পড়ালেখার কাজ। ইচ্ছে হলে সময়ে-অসময়ে ছোটখাট একটা ঘুমও দিয়ে নেই। বিছানাটা চব্বিশ ঘন্টাই পাতা থাকে। রাত্রে কেবল একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে মশারীটা খাটিয়ে নেওয়া।

চায়ের ব্যাপারটা নিজের হাতেই রেখেছি। নীচের ওদের ঘুম ভাঙার দু ঘন্টা আগে আমার ঘুম ভাঙে। চায়ের মুখ চেয়ে দু ঘন্টা বসে থাকতে হলে একশ কুড়ি মিনিট সময় আমার জীবন থেকে বরবাদ হয়ে যাবে।

কেরোসিন তেল, স্টোভ, কাপ-ডিস-গ্লাশ ইত্যাদি থাকে আমার চৌকির নীচে। ওখানে আরও কয়েকটা কৌটোয় থাকে এটা-ওটা। ঘরের এক কোণে ড্রেনঘেঁষে জলের কুঁজো। দিনে অন্তত দশবার আমার স্টোভ জ্বলে চা অথবা কফি করতে। কাপ-ডিস ধোবার ব্যাপারটাও রেখেছি স্বহস্তে। স্বাবলম্বিতার একটা আলাদা স্বাদ আছে। তাছাড়া একটু একসারসাইজও তো হয়।

প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদির জন্য নীচে বারকয়েক নামতে হয়। বাকী সময়টা আমার দর্শন পাওয়া যাবে শয্যায় আমাকে শায়িত অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়। অবশ্য বিকেল চারটে থেকে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে দেখা যাবে সামনের ছাদে আরামকেদারা-আশ্রিত এবং সবান্ধব নাতি-নাতনী-পরিবেষ্টিত।

তখন বসে আমার গল্পের আসর তথা ওদের খেলার আসর। একটা উন্মুক্ত ছাতে ডজনখানেক বাচ্চা একত্র হয়ে কত রকম খেলা যে উদ্ভাবন করে কত তুচ্ছ বস্তুকে কেন্দ্র করে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর ওদের পাহারা দেই। দেখি ওদের ভাব করা, আড়ি দেওয়া। কখনও মীমাংসা করি, কখনও কৌশলে ঝগড়াটা আরও চাগিয়ে দেই। এক-একদিন গল্পটা বেশ জমে উঠলে খেলাটা গৌণ হয়ে যায়।

তারপর সেই 'একদিন'……

সেদিন বাচ্চার দলটি নিয়ে ছাতে বেশ আনন্দে আছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল, আমার চৌকির তলায় কি যেন একটা জান্তব দাপাদাপির শব্দ হচ্ছে।

ওরা তখন খেলায় মত্ত। আমি চুপি চুপি উঠে এলুম। খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখি একটা দারুণ যুদ্ধ শেষ হবার মুখে। পক্ষদ্বয় হল একটা চড়ুই পাখি

আর একটা বিড়াল। দেখতে দেখতে চড়ুইটা পরাজিত ও নিহত হল। এবং নিহত পক্ষীটিকে সানন্দে ভোজন করতে শুরু করল বিজয়ী বিড়ালটি। বুঝলাম, আমারই আশ্রিত চড়ুই পরিবার থেকে একটি কমল।

এই আশ্রিত পরিবারটির প্রতি আমার গভীর মমতা, এবং সে দুর্বলতার কথা জানে বাড়ির সকলেই। আমার মেয়ে তো অভিমান করে বলে,—তোমার মেয়ে না হয়ে একটা চড়ুই হয়ে জন্মালে আমি বেশি আদর পেতাম।

ভীষণ হিংসে তার চড়ুইগুলির উপর।

আমার শয়নকক্ষের একটা ভেন্টিলেটরে বছরখানেক ধরে ওরা ঘর বেঁধে আছে। প্রথমে মাত্র দুটি ছিল। এখন হয়তো গোটা পাঁচছয় হয়েছে। ওদের কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা দেখে দেখে আমার যে কতো অবসর সময় কী আনন্দে কেটে যায়, তা আমি বোঝাব কী করে আমার অষ্টাদশী আধুনিকা কন্যাকে ?

আমার ভালবাসাটা ওরা বুঝে ফেলেছে। আমাকে একটুও ভয় পায় না। মাঝে মাঝে বিস্কুট অথবা মুড়ি গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেই মেঝেয় আমার পায়ের কাছটিতে। 'আয় আয়' বলে ডাকতেই দল ধরে চলে আসে। খুঁটে খুঁটে খায়। মাঝে মাঝে আমার হাত থেকেও ঠুকরে নেয়।

ওদের যাতায়াতের পথ আমার দরজা অথবা জানালা দিয়ে। তাই শীতকালেও অন্তত একটি জানালা সর্বদা ওদের জন্য খুলে রাখি।

আজ হঠাৎ কোথা থেকে এল এই শত্রু ? ঐ ভেন্টিলেটরে তো ওর ওঠবার সাধ্য নেই। চড়ুইটাকে ধরল কী করে ? হয়তো বিড়ালটা ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও ? চড়ুইটা জানালা দিয়ে প্রবেশ করার সময় লাফ মেরে ধরে ফেলেছে। অথবা লুকিয়ে ছিল আমার চৌকির নীচেই। চড়ুইটা হয়তো মেঝে পড়ে থাকা বিস্কুটের টুকরো খেতে এসে ধরা পড়েছে। ইতিপূর্বে শ্রীরাধা ও তার বন্ধুদের বিস্কুট বিতরণ করেছি, তাদেরই পরিত্যক্ত টুকরো-টাকরা পড়ে ছিল হয়তো।

কিন্তু বিড়ালটা প্রবেশ করল কখন কোন্ পথে ? আমার আশ্রিতের প্রাণ সংহার করেছে যে দুর্বৃত্ত, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই।

চুপি চুপি আমার বাচ্চা বাহিনীকে বললাম,—তোরা সবাই মিলে জানালা দুটোর সামনে লাইন করে দাঁড়া, আমি থাকব দরজার আড়ালে। দেখিস যেন জানালা দিয়ে না পালায়। দরজা দিয়ে এলেই আমি ধরব। ও হারামজাদা আমার চড়ুই মেরেছে, ওকে আমি হত্যা করব। ওর গোঁফ কাটব, নাক-কান কাটব, ল্যাজ কাটব।

অপরাধী বিড়ালের শাস্তির ব্যবস্থাটা বাচ্চাবাহিনীর খুবই মনঃপূত হল। ওরা হৈ হৈ করে জানালার কাছে ছুটে আসতেই বিড়ালটা উন্মুক্ত দরজা-পথে দিল এক লাফ, আর শূন্য থেকেই আমি তাকে দুহাতে লুফে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার চারখানা পা এমন কায়দায় আমার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম যে, এক্কেবারে নট্ নড়ন-চড়ন।

পলায়নের অথবা আঁচড়ে কামড়ে দেবার কোন চেষ্টা না করে ও কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করল আমার কাছে। ওকে কোলে নিয়েই বসলাম আমার আরাম-কেদারায়। ও যেন মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়ল আমার কোলের মধ্যে। একটু একটু করে হাত আলগা করছি। ও কিন্তু নড়ছে না, বরং গ-র্-র্ গ-র্-র্ করে একটা আরামের আওয়াজ করছে।

একসময় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে শুরু করলাম ওর মসৃণ কোমল তুষারশুভ্র দেহের উপর। আরামটা যেন ও আয়েস করে উপভোগ করছে। এইমাত্র যে এতবড় একটা হিংস্র কাণ্ড করে এল, ওর বর্তমান আচরণ দেখে তা কে বিশ্বাস করবে ? মনে হবে, ওর মত শান্ত নিরীহ প্রাণী এ জগতে আর দ্বিতীয় নেই।

কি জানি কেন, ওর এই আত্মসমর্পণে আমার রাগটা একেবারে জল হয়ে গেল। ওকে ভালবেসে ফেললাম।

শ্রীরাধার দল তো ওকে ঘিরে হৈ-চৈ শুরু করেছে—আমি কি ভাবে ওর নাক-কান-লেজ কাটি সেটি দেখবার জন্য। ইতিমধ্যে আমার টেবল থেকে ধারালো চাকুখানা এনে আমার হাতে দিয়েছে শ্রীরাধা।

এটি আমার স্পেশাল চাকু। চার ইঞ্চি ফলা। খুললে আট ইঞ্চি ভয়ঙ্কর অস্ত্র। নরহত্যাও করা চলে! খাঁটি স্টীলের জিনিস। অর্ডার দিয়ে করানো। এই চাকু দিয়ে আমি নখ কাটি, পেন্সিল কাটি, ফল কাটি। আবার পুত্র মাঝে মাঝে হাঁস-মুরগী হত্যা করতেও নিয়ে যায়। একটু যত্ন করে ধার দিলে দাড়িও কামানো যায়। সেই বস্তু নিয়ে এসেছে শ্রীরাধা ওর লেজ কাটতে।

ওদের কথায় জানা গেল, এই বিড়ালটাকে ওরা সকলেই চেনে। এর বিরুদ্ধে ওদের অসংখ্য অভিযোগ। চিনতাম না কেবল আমি।

উপরের কলরব শুনে আমার কন্যাসহ বউমাও এসেছেন। ওদেরও দেখছি এর বিরুদ্ধে লম্বা নালিশের ফিরিস্তি। এর মত পাকা চোর নাকি ভূভারতে নেই।

মিটসেপের জাল ছিঁড়েও (জীর্ণ হয়ে গেছিল) নাকি ইনি দুধ-মাছ চুরি করেছেন। এর জ্বালায় নাকি কাঁচের বৈয়মের ঢাকনা থাকে না। খাদ্যের খোঁজে রান্নাঘরের তাকের উপর চড়েও নাকি বেশ কিছু কাপ-ডিস ভেঙেছেন। ইনি যে কোথায় লুকিয়ে থাকেন আর এক মুহূর্তের মধ্যে রান্না মাছ অথবা কোটা মাছ নিয়ে পালান, কেউ জানতে পারে না। এটি একটি সাংঘাতিক চিজ্।

সবচেয়ে মনস্তাপের কথা হল, আজ পর্যন্ত কেউ একে একটা জুৎমত মার দিতে পারে নি। ওদের সব কৌশল সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে এই মহাধূর্ত মহা পাজিটা। আজ যখন ধরা পড়েছে, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই।

তাহলে তোমরাও বলছ, আজ ওটার নাক, কান আর লেজ কেটে দেই ?—হেসে বলি আমি।

জিভটা কেটে দিলেই ঠিক শাস্তি হবে ওর।—বলেন ক্রুদ্ধা বউমা।

একবাক্যে সকলে সমর্থন করে বউমার বিধান।

—কেমন গো শ্রীরাধা, তাহলে এটার নাক, কান, লেজ আর কাটব না তো ? জিভ কাটার পরে আবার লেজ কাটতে বলো না কিন্তু।

না না, লেজও কাটতে হবে আর গোঁফ্।—বাব্বা ! বিচারকগণ এ ব্যাপারে একমত। লেজকাটা একটা কুকুর ওরা এ পাড়ায় মাঝে মাঝে দেখেছে, কিন্তু লেজকাটা বিড়াল কখনও দেখেনি। এবার সে বস্তুটিও দেখতে চায় ওরা।

যে অপরাধীকে নিয়ে এই বিচারসভা বসেছে, সে কি আমার কোলে বসে টালুমালু চোখে তাকাচ্ছে শত্রুপক্ষের দিকে, নাকি নির্বিকার দার্শনিক চোখে দেখছে এইসব মার্জারেতর জীবের কাণ্ডকারখানা ? কে জানে ?

ওর চোখমুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি কেবল ওর স্নিগ্ধ শুভ্র সুকোমল মসৃণ পিঠখানা, কৃষ্ণবর্ণ কান দুখানা আর ধূসর-কৃষ্ণ ডোরাকাটা মাথাটা। ওর লেজেও সাদা কালো ধূসরের অপরূপ কারুকার্য। দেখছি মুগ্ধ চোখে এক সুদক্ষ শিল্পীর পাকা হাতের তুলির কাজ।

আপনি ঐ বদমাসটাকে আবার আদর করছেন !—কড়া গলায় যেন আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন বউমা।

বস্তুত ওর আচরণে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ও আমার আশ্রয় প্রার্থী। ওর সম্মুখে আসন্ন বিপদ। ও শত্রুপরিবেষ্টিত। ওকে আমি এখন শত্রুপক্ষের কাছে সমর্পণ করলে ওর আর রক্ষা থাকবে না। আমার পুত্রদ্বয়ও এসে পড়বে এক্ষুণি অফিস থেকে। তারাও শত্রুপক্ষে যোগ দেবে লাঠিসোটা নিয়ে। ওকে অভয় দেবার জন্যই যেন একটু বেশি করে আদর করছিলাম তখন। বউমা ক্ষিপ্ত হবেন বৈ কি !

তুমি এটির যা বর্ণনা দিলে বউমা,—হেসে বলি আমি ঃ তাতে একে তো আদর না করে পারছি না। বললে, এটা নাকি মহা ধূর্ত, পাকা চোর, নাকি বহু বুদ্ধি খরচ করেও একে আজও পর্যন্ত একটা মার দিতে পারনি। অর্থাৎ এটি তোমাদের চেয়েও বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান নয়, বুদ্ধিমতী। মানে এটি মার্জারী। দেখে তো মনে হয়, ইনি শীগ্‌গিরই মা হতে যাচ্ছেন। এ সময়ে সন্তানের মঙ্গলার্থে ওর পেট ভরে খাওয়া দরকার। তা ও যদি বুদ্ধিমতী না হয়ে বোকা হত, তাহলে তো ওর ভাগ্যে দুধ, মাছ ইত্যাদি জুটত না, জুটত কেবল মার। তাই না ? তুমি নিজে মা হয়ে এই মা-টিকে ক্ষমা করতে পার না ?

আপনার যতো মায়া এইসব ইতর জীবের উপর, আমাদের তো কেবল শাসন। —ফুঁসে ওঠেন বউমা।

"বিড়ালটার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে বউদি,—ফোঁড়ন কাটল আমার কন্যা ঃ কিন্তু তোমার আদরিণী চড়ুইকে যে খেল রাক্ষুসীটা, তার শাস্তি কি দেবে ? নাকি সে অপরাধও ক্ষমা করে দেবে ?

বিষয়টা একটু ভেবে দেখলাম। চড়ুইদের আমি সাবধান হতে বলব। আমিও সাবধান থাকব। তা বলে ওকে সাধু হতে বললে ও বাঁচে কি করে ? চুরি করে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম। ওকে তো ওর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারি না।—গম্ভীর ভাবে বলি আমি ঃ প্রথমে সত্যিই আমার খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু বিচার করে দেখলাম ও অপরাধী নয়। ও কেবল স্বধর্ম পালন করেছে। তাই ওকে ক্ষমা করে দিলাম।

আমরাও আমাদের স্বধর্ম পালন করব।—রেগে বলে কন্যা ঃ সুযোগ পেলেই ওকে লাঠিপেটা করব।

—অবশ্যই সে সুযোগ তোমরা ছাড়বেনা জানি। তবে ও যদি সত্যিই বুদ্ধিমতী হয়, সে সুযোগ তোমাদের দেবেই না, যেমন এতদিন দেয়নি।

আমরা প্রার্থনা করব ও যেন অবিলম্বে তোমার চড়ুই বংশ নির্বংশ করে। দেখব তখন তোমার স্বধর্ম

কতক্ষণ টেকে।—বলতে বলতে রাগে গজ গজ করতে করতে ওরা ছাত থেকে নেমে গেল!

ওনার আবার সব কিছুতেই একটু বাড়া বাড়ি।—যেতে যেতে ফোঁড়ন কাটেন বউমা ঃ সাপ মারবেনা, কুকুর বিড়াল মারবে না, বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলবে না—যতো সব।

শ্রীরাধার দলটা বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল। নাক, কান, লেজ কাটা বিড়ালটার পরিবর্তিত চেহারাটা দেখবার জন্য ওরা দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে বিড়ালটার যে ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে, এটা ওদের মাথায়ই আসেনি। তা ছাড়া চাকুখানা এনেছিল শ্রীরাধা সগর্বে, এখন সে অস্ত্রটি যদি আদৌ ব্যবহার না হয় তাহলে বন্ধুদের কাছে ওর মান থাকে না। ও তাই নিজের মান রক্ষার জন্য একটা উদার প্রস্তাব দিল ঃ আর কিছু কাটতে হবে না দাদু, তুমি কেবল লেজটা কেটে দাও। সবটা নয়, অর্ধেকটা।

—তুমি তো দেখছি খুব দয়াবতী মেয়ে। অর্ধেকটা লেজ কাটলেই একে ক্ষমা করবে তো?

—করব।

—তারপর একে আদর করবে তো?

ঈস্, ঐ চোরকে আবার আদর! তোমার কোলে বসে আছে তাই। ছেড়ে দাও না, দেখাচ্ছি মজা। আমরা সবাই মিলে ওটাকে ঘিরে ধরে আচ্ছা করে পেটাব।—শ্রীরাধা এবং তার বন্ধুগণ বলে একবাক্যে।

—ঠিক আছে। এইটেই সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব। তোমরাই এর শাস্তি দাও। খুব মজা হবে।

ওরা এবার সত্যিই একটা মজার খেলা পেয়ে গেল। ছোটাছুটি করে কেউ নিয়ে এল স্কেল, কেউ রুলার, কেউ একখানা সরু লাঠি, কেউ একটা ঝাঁটা, কেউ ঘুড়ির লাটাই, কেউবা কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে মুঠো ভরতি খোয়া। ওদের অনুপস্থিতিতে বিড়ালটাকে যাতে ছেড়ে না দিই সেজন্যে ওরা পরামর্শ করে শ্রীরাধাকে প্রহরী নিযুক্ত করে গেছিল। প্রহরীর দিকে তাকিয়ে আমি অভিমান ভরে বলি,—এত অবিশ্বাস! আমি তো কথা দিয়েছি। তবু আমাকে পাহারা দিতে হবে?

—আমি বুঝি পাহারা দিচ্ছি? আমি তো একটা কথা বলব বলে……

গোপন কথা?—মিটি মিটি হেসে বলি আমি।

—হ্যাঁ গো মশাই। সবার সামনে বলতে লজ্জা করে না?

—তবে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে বলে ফ্যালো, ওরা আসবার আগেই।

আমার কানের কাছে মুখ এনে শ্রীরাধা বলে,—তুমি না এটাকে আর একটুও ভালবাসবে না কিন্তু। ওটা খুব বিচ্ছিরি।

—কেবল তোমাকেই ভালবাসব তো?

যাঃ, অসভ্য!—পাকা গিন্নীর মত মুখ করে রাধা বলে।

শ্রীরাধার গোপন কথাটি শুনবার পর পরই এসে পড়েছিল তার সশস্ত্র সেনাবাহিনী। তারা এসেই ঘিরে দাঁড়াল আমার ইজি চেয়ারটা। যে যার অস্ত্র তুলে রণ হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। আমার কোলে বসেও এবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল বিড়ালটা। একটা মোক্ষম মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম,—চাচা, আপন বাঁচা।

অতবড় কঠিন বেষ্টনী ভেদ করে এক মুহূর্তে সেটা ছাতের রেলিঙ পেরিয়ে পড়ল পায়খানার ছাতে, সেখান থেকে আর এক লাফে প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ল রাস্তায় এবং আধ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অক্ষত শরীরে। একটা যেন ভোজবাজী দেখিয়ে গেল। ওরা ওদের কোন অস্ত্র প্রয়োগেরই সুযোগ পেলনা।

আমি প্রাণ খুলে হাসলাম। ওরা প্রাণভরে আমায় বকল।

তোমার আদুরী তো।—ঠোঁট ফুলিয়ে বলে শ্রীরাধা ঃ তাই এমন কায়দা করে ছাড়লে যাতে ও পালিয়ে যেতে পারে।

সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল 'আদুরী'।

নামটা যে ওর খুব পছন্দ হয়েছিল সেটা বুঝলাম কদিন পরেই। আমি 'আদুরী' বলে ডাক দিলেই আধ মাইল দূর থেকেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে দর্শন দিতে শুরু করল।

ক্রমে ক্রমে আমার দোতলাটাই ওর স্থায়ী ঠিকানা করে নিল। নীচের রান্নাঘরে অথবা তাদের খাবার সময় আদুরীকে আর দেখতে পায়না কেউ। ও বুঝে নিয়েছে নীচের লোকগুলি ওর শত্রুপক্ষ। ওর সবটুকু ভালবাসা আমাকে উজাড় করে দিয়ে ও নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আছে বর্তমানে। এবং ইতিমধ্যেই আদুরীর প্রতি ঈর্ষাবশে শ্রীরাধা আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে।

অগ্নিরথ

সঙ্কর্ষণ রায়

আগে যা ঘটেছে

[১৯৪২ সালের মার্চ মাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তান্ডবের মাঝে তাই ফৌজী বিমানে চেপে আমরা দুটি পরিবার পালাচ্ছি বর্মা ছেড়ে। বাবা বর্মায় তাই আমাদের দলটির ভার আমার উপরে। আমি, মা, মাসিমা, ছোট ভাই দেবব্রত, পুতুলদি ও বুলুদি। এছাড়া আছে লুসি নামে একটি কিশোরী, ম্যাগোয়ের ডেপুটি কমিশনারের ভাগ্নী। মা-মাসিমা বাদে আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে। বুলুদি বসার জায়গা পেলে পুতুলদির সিটের জন্য কো-পাইলট রবার্ট রুপার্টকে বলে, নিচে বম্বিং-চেম্বারে নিয়ে যেতে। কো-পাইলটের সঙ্গে আমরা যখন তর্কে মত্ত, তখনই হঠাৎ নিচে থেকে ভেসে এল পুতুলদির আর্তস্বর। সঙ্গে সঙ্গে নিচে ছুটে গিয়ে দেখি, রুপার্ট বম্বিং রডে হাত দিয়ে মজা করছে।...যদিও ওকে সে জানায় বোমা নেই। প্লেন নামে আসানসোলে। লুসির দাদা অগ্নিমিত্র সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার গাড়ি অগ্নিরথে সবাইকে রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছবার কথা উঠলে সে জানায় এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী আসবেন তাই তাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা চমকে উঠি, কে এই সন্ন্যাসিনী ?...তারপর ?]

।। তিন ।।

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বড় স্কুল আছে আসানসোলে, সেই স্কুলের হোস্টেলেরই একটি ঘরে। খিচুড়ি, বেগুনভাজা ও পাঁচমিশেলি তরকারি দিয়ে আমাদের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাঞ্চ সারলাম।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে ঘরে ঢুকল অগ্নিমিত্র। লুসি তার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—তোর ব্যাপার কি বল্ তো দাদা, এতক্ষণ বাদে তোর সময় হল আমাদের খবর নেবার ?

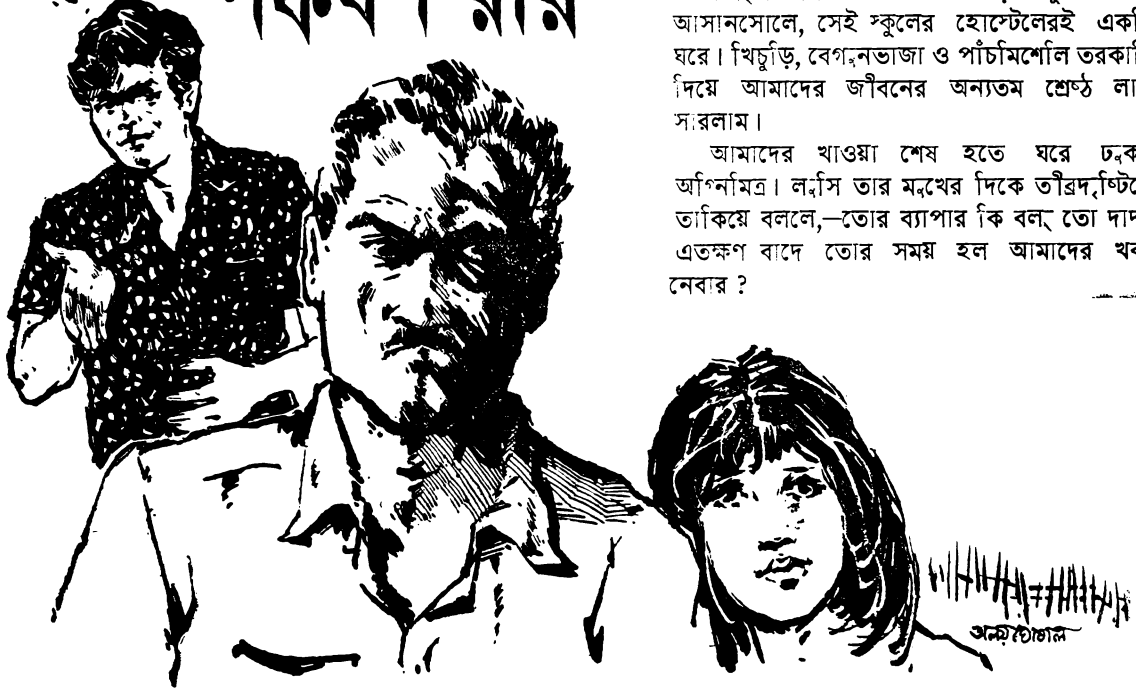

অগ্নিমিত্র বলল,—তোদের খবর তো স্বামীজীরাই নিচ্ছেন। আমি খবর না নিলেও এঁদের ব্যবস্থার তো কোন ত্রুটি নেই।

তারপর সে ফিরল আমার দিকে,—খাওয়া তো হল, এখন পোস্ট্-অফিসে চল, তোমাদের কলকাতার বাড়িতে ফোন করবে।

আমি বললাম,—আমাদের বাড়িতে ফোন নেই, ফোন আছে কাকার অফিসে।

—তা হলে চল তোমার কাকাকে ফোন করে বলবে যে বিকেল তিনটের গাড়িতে আসানসোল থেকে রওনা হয়ে রাত আটটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পেঁছবে—তিনি বা তোমার বাড়ির আর কেউ যেন স্টেশনে হাজির থাকেনই। বাবাকে তাঁর লালবাজারের অফিসে টেলিফোনে আমি খবর দিয়ে দিয়েছি যে লুসি তোমাদের সঙ্গে যাবে—তিনি মাকে নিয়ে স্টেশনে সময়মত উপস্থিত থাকবেন।

লুসি বললে,—আমি ভেবেছিলাম তুই আমাকে নিয়ে যাবি কলকাতায়।

—নারে সিসি—এই যুদ্ধের মধ্যে কোলিয়ারি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই আমার। ভোরে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। কোন ভাবনা নেই তোর। বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—তোদের ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পেঁছবার অনেক আগেই তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হবেন। মিস্টার স্যাঙ্ক্, আর দেরি নয়, এখন চল পোস্ট অফিসে গিয়ে তোমার কাকার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

হ্যাঁ চলুন।—উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম।

অগ্নিমিত্র বললে,—তোমার কাকাকে যদি টেলিফোনে না পাও, হাওড়া স্টেশন থেকে আমার বাবার গাড়ি করে তোমাদের বাড়ি যেতে পারবে।

—কিন্তু আমাদের বাসার ঠিকানা তো আমি জানি না। সম্প্রতি বাসা বদল করা হয়েছে, রেঙ্গুন ফল করার পর থেকে কলকাতা থেকে মিনবুতে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে নতুন ঠিকানাটি জানতে পারি নি।

—তাহলে আজ রাতটা তোমরা আমাদের বাড়িতে কাটাও—কাল সকালে আমার বাবা তোমার কাকার সঙ্গে তাঁর অফিসে যোগাযোগ করবেন।

অগ্নিমিত্রের সঙ্গে হোস্টেলের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। বাইরে দাঁড়িয়েছিল তার গাড়ি—গাড়ির চালকের আসনে উঠতে উঠতে সে আমাকে ইশারা করল তার পাশে বসবার জন্য।

অগ্নিমিত্রের পাশে বসতে গিয়ে গাড়ির পিছনে তাকাই একবার। গাড়ির পেছনে বসে আছেন গেরুয়া রঙের কাপড় ও চাদর মোড়া একটি মূর্তি। তাঁর মুখ-চোখ বা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছুই দেখতে পাই না, কাজেই বুঝতে পারি না তিনি কে। তবে আন্দাজ করতে পারি যে ইনিই সেই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী, যাঁর জন্য অগ্নিমিত্র এয়ার পোর্টে থেকে গিয়েছিল।

অগ্নিমিত্রের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মুখ-চোখে একটা চাপা নিষেধের আভাস পাই, গাড়ির পেছনে যিনিই থাকুন, তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করতে নিষেধ করছে যেন সে।

পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাকে নিয়ে পোস্ট অফিসের মধ্যে ঢুকল অগ্নিমিত্র। পোস্ট-মাস্টারকে আমার কাকার টেলিফোন নম্বর দিয়ে সে আমাকে বললে,—খানিকক্ষণ পোস্টমাস্টার মশাইয়ের জিম্মায় থাক, আমি ঘুরে আসছি।

কোথায় যাচ্ছেন?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—যেখানেই যাই, একটু বাদেই ফিরে আসব—তোমার কোন ভয় নেই।

পোস্টমাস্টারমশাই আমাকে বসতে বলে আসানসোলের ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কলকাতায় আমার কাকার অফিসের নম্বর চাইলেন। এক্সচেঞ্জ থেকে বললে,—লাইন পেতে সময় লাগবে কারণ যুদ্ধ এখন সব ব্যাপারের মত টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও মিলিটারির অগ্রাধিকার এনে দিয়েছে।

পোস্টমাস্টারমশাই তখন বললেন,—এও মিলিটারির ব্যাপার ভাই, কারণ যুদ্ধই এদের কর্মছাড়া করেছে।

পোস্টমাস্টারমশাইয়ের কথায় ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জের সুপারভাইজারের মন ভিজল কি না বোঝা গেল না। পোস্টমাস্টারমশাই আমাকে বললেন,—একটু বসতে হবে ভাই।

বসলাম। শক্ত কাঠের চেয়ার, তবু ঘুম এসে গেল। গতকাল সারা রাত ঘুম হয় নি। চিরদিনের মত বর্মা ছেড়ে চলে আসছি, সেখানে আমাদের শেষ রাতটি ঘুমিয়ে কাটাতে পারি নি। সারারাত বসে বসে সেদেশে আমাদের বারো বছরের স্মৃতি রোমন্থন করেছি, আর কান পেতে শুনেছি চারপাশে প্যাগোডার ঘণ্টা। সে ঘণ্টা এখনও যেন আমার কানে বাজছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে সব প্যাগোডার মধ্যে উজ্জ্বলতম মিয়াহ্তলো প্যাগোডার সোনালী স্মৃতি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুদূর বিপুল সুদূরের মধ্যে তারা নির্বাসিত হল! বাবা...মাস্টারমশাই...মেসোমশাই... দীপঙ্কর, তারাও কী লীন হয়ে রইল এই দূরত্বের মধ্যে...ম্যাগোয়ে এরোড্রোমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাদা দীপঙ্করকে দেখতে পাই...সে যেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ তন্দ্রাবেশ ছুটে গেল পোস্টমাস্টারমশাইয়ের ডাকে। ছুটে গেলাম টেলিফোনের দিকে।

রিসিভার তুলে বলি,—কাকা, আমি সংকু, আসানসোল থেকে বলছি!

ওপাশে কাকা বোধহয় বিস্ময়ে নির্বাক। সব কথা আমি খুলে বলার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন,—তোর

দাদাদের কাউকে তা হলে আসানসোলে পাঠিয়ে দিই ?

তার কোন দরকার নেই।—আমি বললাম : আমরা বিকেল তিনটার গাড়িতে রওনা হচ্ছি...হাওড়া স্টেশনে কেউ থাকলেই চলবে।

—তোরা নিজেরা আসতে পারবি তো ?

—হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হবে না—মিশনের স্বামীজীরা আমাদের ট্রেনে তুলে দেবেন।

কাকার সঙ্গে আমার কথা শেষ হবার আগেই অগ্নিমিত্র ফিরে এল। আমার কথা শেষ হতেই বললে, যাক্ তোমার কাকার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাহলে পেরেছ যোগাযোগ করতে—হাওড়া স্টেশনে কেউ না কেউ হাজির থাকবেন তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য।

হ্যাঁ।—আমি বললাম : এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু যদি কোন কারণে কেউ হাওড়া স্টেশনে হাজির হতে না পারেন—তাহলে কি করবে ? তোমার কাকার কাছ থেকে তোমাদের নতুন বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছ তো ?

না তো।—আমি ঢোঁক গিলে বললাম : ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছে।

—থাক গে, তাতে কিছু এসে যাবে না—কারণ স্টেশনে কেউ আসবেন না এমন হতেই পারে না। এখন চল, হোস্টেল থেকে সকলকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টেশনে যাই—তিনটে বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে অগ্নিমিত্রের গাড়িতে উঠতে গিয়ে সেই গেরুয়াধারীর দেখা পেলাম না। গাড়ির পেছনের সীটের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করতে অগ্নিমিত্র বললে,—মাতাজীকে খুঁজছ তো ? তাঁকে এখানকার সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলাম। মাতাজী খুবই অসুস্থ, ডাক্তার সামন্তকেও খবর দিয়ে এসেছি তাঁকে দেখে আসার জন্য।

এই মাতাজীও বুঝি ম্যাগোয়ে থেকে এলেন ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ, তোমাদের পরের প্লেনেই এসেছেন।

গাড়িতে উঠে বসি। আমার পাশে চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অগ্নিমিত্র বললে,—তোমাদের কলকাতার বাড়ীতে কে কে আছেন ?

ছিলেন অনেকেই।—আমি জবাব দিলাম : পঁচিশ জনের বিরাট একান্নবর্তী পরিবার আমাদের, কিন্তু এখন পঁচিশ জনের মধ্যে আঠারো জনকেই পূর্ববঙ্গে আমাদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় রয়ে গেছেন সাতজন। কাকা-কাকীমা, তিন জ্যাঠতুতো এবং একজন খুড়তুতো দাদা, ও ছোট খুড়তুতো বোন, বড় বাড়ি ছেড়ে তাদের নিয়ে ছোট একটা বাড়িতে শিফ্‌ট করেছেন কাকা।

—জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো মিলিয়ে চারজন দাদা তোমার, তাই না ?

—না, দেশের বাড়িতে আছেন আরও চারজন, বর্মায় রেখে এসেছি আমার নিজের দাদাকে।

তাছাড়া আর একজন দাদা আছেন,—আমি বলে চলি : তিনি আমাদের সবচেয়ে বড় দাদা...তিনি আছেন জেলে।

জেলে !—চমকে উঠলেন অগ্নিমিত্র।

—হ্যাঁ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতেই ইংরেজ সরকার তাঁকে জেলে পুরেছে রাজবন্দী হিসেবে ! শুনেছি, খুব বড় একজন বিপ্লবী তিনি।

—কি নাম তাঁর ?

আমি নাম বলতেই অগ্নিমিত্র আর একবার চমকে উঠল। তারপর কি রকম যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

আমার দাদাকে কি আপনি চেনেন ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

না।—অগ্নিমিত্র কাষ্ঠহাসি হাসল : আমি চিনব কি করে। যে পরিবেশে আমি মানুষ, তার মধ্যে কোন বিপ্লবীকে চেনা সম্ভব নয়। এখন চল, তিনটে বাজতে আর বেশি বাকি নেই।

তখন দুটো বেজে পনেরো মিনিট। হোস্টেল থেকে সকলকে তুলে নিয়ে আসানসোলের রেল স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে আধঘণ্টা লেগে গেল।

তিনটের সময় কলকাতাগামী প্রায় শূন্য এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসানসোল স্টেশনে এসে ঢুকল। তখন বোমার ভয়ে প্রায় কেউই কলকাতায় যাচ্ছে না, ১৯৪১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রেঙ্গুনে বোমা পড়ার পর থেকে কলকাতায় বোমা বর্ষণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং আতঙ্কিত শহরবাসী সকলেই। এই আতঙ্কের ঠেলায় দলে দলে লোক কলকাতা থেকে পালিয়ে আসছে এবং নেহাৎ কোন ঠেকা না থাকলে কেউই যাচ্ছে না কলকাতার দিকে। এ হেন অবস্থায় আমাদের কলকাতায় যাওয়াকে আসানসোল স্টেশনের সকলে চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা বলেই মনে করল। শূন্য একটি থার্ডক্লাস কামরায় আমাদের উঠে বসাকে তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে।

ট্রেনের সামনে থেকে পেছনে সব কটি বগি দেখে এসে অগ্নিমিত্র বলছে,—মনে হচ্ছে তোমরা ছাড়া আর কেউই এই ট্রেনে হাওড়া যাচ্ছে না। তারজন্য তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ চোর-ডাকাতদেরও বোমার ভয় আছে।

লুসি বললে,—হ্যাঁরে দাদা কলকাতায় সত্যিই কি বোমার ভয় আছে ?

অগ্নিমিত্র বললে,—শুধু কলকাতায় কেন, আসানসোল, ধানবাদ, বর্ধমান সব জায়গাতেই আছে। জাপানী বোমারু বিমান বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে কলকাতা পেরিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত আসতে পারে।

আসতে পারে বললেই হল !—লুসি ঝাঁজালো স্বরে

বললে : বৃটিশ ও আমেরিকানদের অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্ট গান্ নেই, ফাইটার প্লেন নেই ?

—আছে বই কি। কিন্তু থেকেও যে কিছু কাজ হয় না তার প্রমাণ সিংগাপুর ও রেংগুনে পাওয়া গিয়েছে এবং এও দেখা গিয়েছে যে শুধু বড় বড় শহর নয়, ছোটখাট শহর এবং গ্রামের ওপরেও বোমা পড়তে পারে। কাজেই কলকাতা শহরকে আলাদা করে ভয় পাবার কিছু নেই। বোমার ভয় যখন সর্বত্রই আছে, তখন নির্ভয় হওয়াই ভাল।

কিন্তু নির্ভয় যে কেউ হতে পারছে না তা বোঝা গেল ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছে। লুসি ও আমি প্লাটফর্মের সামনে ও পেছনে কয়েকটা বগী ঘুরে এসে দেখলাম সমস্ত ট্রেনে আমরা ছাড়া বিশজন যাত্রীও অবশিষ্ট আছে কি-না সন্দেহ।

আমাদের অনুমান যে নির্ভুল তা বুঝতে পারলাম হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে।

হাওড়া স্টেশনের প্রায় শূন্য ন নম্বর প্লাটফর্মে আমরা ছাড়া আর কেউই নামল না। নির্জন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের জ্যাঠতুতো দুই দাদা। আর দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা, অনুমানে বুঝলাম ইনি লুসির মা মিসেস মুর। লুসি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তুমি একা কেন মা ?

একা কোথায়—এরা আছে আমার সংগে।—বলে হাসিমুখে দাদাদের দিকে তাকালেন।

—বাবা কোথায় ?

—তোমার বাবা এই একটু আগে আসানসোল রওনা হলেন দুটো গাড়িতে বারোজন আর্মড্ পুলিশ নিয়ে।

—আমরা আসানসোল থেকে এলাম, আর বাবা আসানসোল রওনা হলেন ! ব্যাপার কি মা ?

—ব্যাপার কি সে কি আর তোমার বাবা কাউকে কিছু বলবেন ! আমি প্রশ্ন করে কোন জবাব পাই নি। তবে তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট্ ম্যাক্গিলএর কাছে জানলাম যে একজন পুরোনো টেররিস্টকে আজ দুপুর থেকে নাকি আসানসোলে দেখা গিয়েছে...বাইশ বছর আগে সেই যে এন্কাউন্টার হয়েছিল, তাতে সে বেঁচে গিয়ে নাকি পালিয়েছিল দেশ ছেড়ে।...

—কই আসানসোলে আমরা তো তেমন কাউকে দেখতে পাই নি !

—তোমরা দেখবে কি করে ! টেররিস্ট কি দেখে চেনা যায় ! ম্যাক্গিল বলছিল সে নাকি আজই বর্মা থেকে এসেছে—এমনও হতে পারে যে তোমাদের প্লেনেই এসেছে।

আমাদের প্লেনে এসেছে !—লুসি অবাক হয়ে তাকাল তার মায়ের মুখের দিকে : আমাদের প্লেনে তো বয়স্ক পুরুষ-মানুষ কেউ ছিল না, ছেলেদের মধ্যে শ্যাংকই বয়সে সবচেয়ে বড়। অন্য প্লেনগুলোরও একই অবস্থা, মানে কোনটিতেই বয়স্ক পুরুষ-মানুষ ছিল না।

টেররিস্ট মানে কি শুধু পুরুষ-মানুষ !—মৃদু হাসেন মিসেস মুর : মেয়ে টেররিস্টও তো হতে পারে। যাক্ গে সে কথা, এখন এস তোমাদের পার্টির সকলের সংগে আলাপ করি।

আলাপ করতে হলে আমাদের বাড়িতে গিয়ে করবেন। —আমার দুই দাদার মধ্যে একজন বললেন : আপনাদের বাড়িতেও করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে নয়। কারণ হাওড়ার ব্রিজ আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই খুলে ফেলা হবে। এখন খুললে কাল ভোরের আগে জুড়ে দেবে না।

[চলবে]

বিচিত্র এই বসুন্ধরায়

হীরক দাশ

১৯২২ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর লিবিয়ার আল-আজিজিয়া নামক স্থানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ১৩৬.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ আধ-ফোটা জলের উষ্ণতার সমান। একটি দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল শূন্যের নিচে ১২৬.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। ১৯৬০ সালে ২৪শে আগস্ট, কুমেরুর ভোস্তক অঞ্চলে। এই অঞ্চলে অবশ্য জনবসতি ছিল না। ওময়াকন্ নামে সাইবেরিয়ার (রাশিয়া) একটি গ্রামের লোকেরা ১৯৬৪ সালের বেশ ক সপ্তাহ কাটিয়েছিল শূন্যের নিচে ৯৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায়।

বছরব্যাপী পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে উষ্ণ স্থান হলো ইথিওপিয়ার ডালার অঞ্চলটি। এখানকার বাৎসরিক তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৯৪ ডিগ্রি। আর কুমেরুতে সারা বছরই কনকনে ঠাণ্ডা, সেখানকার তাপমাত্রা কখনোই শূন্যের নিচে ৭২ ডিগ্রির কম নয়।

খরার বিশ্বরেকর্ড আছে চিলি দেশের আটাকামা অঞ্চলে। সেখানে একটানা প্রায় চারশ বছর ধরে খরা চলছিল, ষোড়শ শতাব্দী থেকে। তুষার পাতের একদিনের বিশ্বরেকর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলভার লেক অঞ্চলে। ১৫ই এপ্রিল ১৯২১ সালে সেখানে ৭৬ ইঞ্চি তুষারপাত ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের রেইনিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে ১২২৫ ইঞ্চি তুষার পড়েছিল ১৯৭১-৭২ সালে। এটি এক বছরে তুষারপাতের বিশ্ব-রেকর্ড।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী।

গন্তব্যস্থল হাসিমারা ফরেস্টের উত্তরে বল্লালগুড়ি ফরেস্ট হলং নদী।

টোটোপাড়া অথবা টোটো হিল্‌সের পাদদেশে সৃষ্টি হয়েছে এই হলং নদীর। এখানে জল বয়ে যায় তির তির করে! ১২।১৪ মাইল নীচে এরই ধারে গড়ে উঠেছে গভীর বনে হলং টুরিষ্ট লজ। মাদারীহাট থেকে মাত্র মাইল চারেক দূরত্বে। নদী এখানে বেশ গভীর। আর বর্ষার সময় তো প্রচণ্ড রূপ তার।

বল্লালগুড়ি ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট খবর পাঠিয়েছিলেন হলং নদীর ধারে প্রতি রাত্রে নানা রকম জন্তু জানোয়ার জল খেতে আসে। হরিণ, শুয়োর তো আসেই, সেই সঙ্গে ভীড় করে চিতা, বাঘ, গণ্ডার এবং হাতি। কয়েক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেণ্টের কুয়োর ধারে এসে কলা বাগান থেকে দু'কাঁধি আধপাকা কলা খেয়ে গেছে। বাগানটাও তছ নছ করে দিয়ে গেছে।

সবে বন্দুকে হাতে খড়ি হয়েছে। একক প্রচেষ্টায় গোটা কয়েক শুয়োর মেরেছি আর দলগত ভাবে মেরেছি একটা চিতা আর একটা বাঘ। নেহাৎ ওদের মৃত্যু ছিল কপালে তাই মারা পড়েছে। নইলে হরিণ মারা এস· জি গুলিতে চিতা একবারেই কাত!

এতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল দারুণ। কয়েক বছর আগেও রাতে বাথরুমে যেতে হলে মাকে দাঁড়াতে হত। এখন বন্দুক হাতে রাতের পর রাত ঝোপ ঝাড়ে অপেক্ষা করি। মাঝে মধ্যে ভূতের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় ছিল না।

ঠিক হল সন্ধ্যে রাতেই বল্লালগুড়ি রওনা দেব। বাবার কর্মস্থল ভূমচিপাড়া চা-বাগান থেকে এর দূরত্ব

• রোমাঞ্চকর অরণ্য-রাত্রি •

তুষারকান্তি বসু

মাইল দুয়েক। তিন মাইল চা বাগান ৷তারপর তিন মাইল তিঁতি ফরেস্ট। তিঁতি ফরেস্টে ঢুকতে একটা চেক পোস্ট আছে। সন্ধ্যে রাতেই তাতে তালা পড়ে যায়। তবে প্রেসিডেন্ট গার্ডকে আটটা পর্যন্ত গেটটা খোলা রাখতে বলেছিলেন যাতে আমরা একটু দেরী করে গেলেও ঢুকতে পারি।

তিন জোড়া শিকার পার্টি ঠিক হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল আমার সহচর শনি-চারোয়া। আমার মাস্তুতো দাদা সন্তুদার সঙ্গে ছিলেন কাকা। সবাই তাকে চাচা বলে ডাকতেন। আর তৃতীয় দলে ছিলেন আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা, মনি দা। তার সহচর ছিল রাম নামে একজন মুণ্ডা শিকারী।

হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার দাদা, নিজের দাদা তাঁর একমাত্র ওরস্টেডের গরম ফুলপ্যান্ট, আর্মি জার্কিং এবং মাউন্টেন বুট পরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসলেন।

সবাই আশ্চর্য হ'য়ে তাকালেন। মন্টু দা, মানে দাদা শিকার টিকার পছন্দ করেন না। বন্দুকেও হাত দেন না কখনও।

মন্টুদা মুচকি হেসে বললেন,—আমিও যাব শিকারে।

আমরা তো আগেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। তাই শম্ভুদা সাধারণ ভাবেই বললেন—তুমি ?

—নয় কেন ?

বাহাদুর ততক্ষণে টেবিলে প্লেট নামিয়ে দিয়ে গেছে। মন্টুদা অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে বললেন,—তোমরা যেতে পার, আমার যেতে দোষ কি ? একটু থেমে বললেন,—তাছাড়া রাত্রে বনেবাদাড়ে গাড়ী চালাবে কে ? গাড়ী খারাপ হলেই বা কি হবে ?

কথাটা সত্যি। আমাদের গ্রুপের মধ্যে একমাত্র আমিই গাড়ী চালাতে পারি। তা ও চলনসই। সবে মাস দুয়েক হল 'এল' লাইসেন্স পেয়েছি। গাড়ীর কলকব্জা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ফ্ল্যাট টায়ার পাল্টাতে পারি আর পারি শিরিষ কাগজ দিয়ে ডিষ্ট্রি-বিউটর পয়েন্ট ঘষতে—প্রয়োজন থাক আর নাই থাক। একবার গভীর অরণ্যে সারা রাত গাড়ী নিয়ে সে যে কি নাকানি চোবানি খেয়েছি তা মনে করলে এখনো গায়ে কাঁপুনি জাগে।

শেষ পর্যন্ত মন্টুদার যাওয়া আমরা রোধ করতে চাইলাম না। বিশেষ করে গাড়ী সারাবার কথায়। তখন ওই তল্লাটে দাদার মত ভাল মেকানিক আর কেউ ছিলেন না। কারণ, সে বছরই দাদা কোলকাতা থেকে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছেন।

বেজোড় টীম নিয়ে একটু অসুবিধা দেখা দিল। আমরা কেউ একা বসতে রাজী নই, আর তা উচিৎও না। শুয়োর কিংবা হরিণ মারতে গিয়ে হাতি, গণ্ডার কিংবা বাঘের সামনে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমার সহচর শনিচারোয়া ভাল শিকারী। এক-কালে মিলিটারিতে ছিল। মনিপুর-বার্মা সীমান্তে মিত্র পক্ষের হ'য়ে লড়াই করেছে। তাছাড়া একবার তাড়ি খাওয়া অবস্থায় ভুটানি গাদা বন্দুক হাতে শুয়োর মারতে গিয়ে সে ডোরাকাটা বাঘের মুখোমুখি পড়ে যায়। শুয়োর ভেবে জালের কাঠি ভরা দু ইঞি বারুদ ঠাসা বন্দুক দিয়ে গুলি করে বসে। লোকজন এসে দেখে শনিচারোয়া ঝোপের ধারে চিত হয়ে গোঙাচ্ছে। গুলির ধাক্কা সামলাতে না পেরে তার মাথা আঘাত করে প্রকাণ্ড এক পাথরে। মাথা ফেটে রক্তারক্তি। ওদিকে বাঘও রক্তের বন্যার মধ্যে পড়ে রয়েছে। অবশ্যই মৃত।

সেদিক থেকে আমার টিম বেশ মজবুত। মনিদার টিমও স্ট্রং মনিদার সঙ্গে ছিল দুটো অস্ত্র। একটা ১২ বোরের শটগান অন্যটা ৪৭৫ উইনচেষ্টার রাইফেল। এ ছাড়া মনিদার সাহসী শিকারী হিসাবে খুব নাম ছিল। হাতের নিশানও খুব ভাল। এদের মধ্যে কিছুটা কম-জোরি ছিলেন শম্ভুদা ও কাকার টিম। ওদের অভিজ্ঞতাও কম, আবার অস্ত্রটাও তেমন ভাল নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, রাম চলে আসবে শম্ভুদা ও কাকার টিমে। সঙ্গে বারো বোরের বন্দুক। আর আমার দাদা মানে মন্টুদা আসবেন মনিদার টিমে।

খাওয়ার পর জলের বোতল আর চায়ের ফ্লাক্স নিয়ে সবাই গাড়ীতে উঠলাম। ষ্টিয়ারিং এ মণ্টুদা। মিলিটারি মডেল জীপটায় হুড-ফুড বলতে কিছুই নেই। শিকারের সুবিধার জন্য খুলে ফেলা হয়েছে !

টি টি রেঞ্জের গেট খোলাই ছিল। তখনকার দিনে বনে বাঘ হরিণ শিকার করা গেলেও গেম এসোসিয়েশনের লাইসেন্স প্রয়োজন হত। শুয়োর টুয়োর অবশ্য মারা যেত। বনের বাইরে যা খুশী মারা যেত। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের সীমানার বাইরে হলং নদীর পশ্চিম পাড়ে বসব। ওপারেই ফরেস্ট। প্রেসিডেণ্ট ঐ রাত্রেই তাঁর একনলা বন্দুক নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলেন।

হলং নদীটা এখানে মাত্র ৩০/৪০ গজ চওড়া।

জলের গভীরতা কোন জায়গাতেই এক কোমরের বেশী না।

ধান খেত ছাড়িয়ে শুরু হল নলখাগড়ার বন। তারপর শ্যাওড়া, লালী আর কষাই গাছের সঙ্গে খয়ের গাছের গভীর বন। অন্যান্য লতাগুল্ম এখানে কম। মাঝে মাঝে এপার থেকে ওপারে পায়ে চলার পথ চলে গেছে। জানা গেল এই পথে দিনে যেমন মানুষ চলাচল করে, তেমনি রাত্রে বিচরণ করে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার। কিছুদিন আগে হাতির পালও এই ধরনের একটা পথ ধরেই হাসিমারা ফরেস্ট থেকে বল্লালগুড়িতে এসেছিল।

আধ মাইলটাক হাঁটার পর নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। পৌষ মাসের শেষ দিক! তখনো ধান কাটা সারা হয় নি। এই ধানের লোভে বল্লালগুড়িতে হানা দেয় শুয়োর, হরিণ, হাতি। মাঝে মাঝে বাইসনও দেখা দেয়।

প্রেসিডেণ্টও আমাদের সঙ্গে বসবেন বলে জানালেন। আপত্তি করার কিছু নেই। নিশ্চুপ হয়ে কোন প্রকার নড়া-চড়া না করে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে অনেকেই পারেন না। তার মানে শিকারও পাওয়া যায় না। বনাঞ্চলের অধিবাসীরা কিন্তু এভাবে বসে থাকতে অভ্যস্ত!

ঠিক হল চারটি টিম হবে। প্রথমে একটা পথের ধারে ঝোপের মাঝে বসবেন মনিদা আর মেজদা। তারপর অন্য পথের ধারে শম্ভুদা আর কাকা। এরপর আমি আর একেবারে শেষে প্রেসিডেণ্ট আর রাম।

মনিদা আর মন্টুদা যেখানে বসলেন সেখানে বনের গভীরতা একটু বেশী। লুকিয়ে থাকার মত বেশ সুন্দর একটা জায়গাও পাওয়া গেল। নলখাগড়া আর হোগলা বনের মাঝখানে একটু জায়গা কেটে সেগুলো বিছিয়ে দেওয়া হল বসবার জন্য। চারপাশে কাঁটা ঝোপ। এরই ফাঁক দিয়ে নালা এবং পথের ওপর নজর রাখা যাবে। দাদাদের বসিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। প্রায় আধ মাইল ওপর দিকে বসলেন শম্ভুদা আর কাকা। একটা ভাঙ্গা মাটির ঢিবির আড়ালে তাঁরা বসলেন। চারপাশে ঝোপ-ঝাড়। পাশেই নদী। নদীর পাড়টা এখানে খাড়াই। ডানদিকে সরু পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে নীচে একটা হাতি এসে দাঁড়ালেও পিঠ দেখা যাবে না। এঁদের স্পটটা আমাদের কাছে সব চাইতে ভাল বলে মনে হল!

আমার জায়গা হল একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের ফোকরে। নদীর ধারেই। ডানপাশে একটা সরু রাস্তাও আছে। অন্ধকারে বুঝতে না পারলেও দূরে একটা গাছ দেখিয়ে প্রেসিডেণ্ট বললেন, ওই আমড়া গাছের ফল খেতে প্রায়ই সম্বর আসে। তাছাড়া আমাদের চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য শিমুল ফুলের লোভে বার্কিং ডিয়ারও আসে। অবশ্য তারা আসে ভোরে। তাই ঐ সময়ে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

মনিদার দোনালা বন্দুকটা শম্ভুদাকে দিয়ে তাদের একনলা বন্দুক নিয়ে রাম ও প্রেসিডেণ্ট আরো ভাটিতে নেমে গেলেন। ওদের সঙ্গে দুটো একনলা বন্দুক।

ওরা চলে যাওয়ার পর চারিদিক নিঝুম হয়ে গেল। আমি আর শনিচারোয়া বসেছিলাম মাটিতে বস্তা পেতে। সামনে পেছনে আগিয়া পাত নামে বিষাক্ত বিছুটি পাতার বন। এই পাতা এত মারাত্মক যে, চামড়ার যে কোন জায়গায় লাগলে প্রায় মাসখানেক তার জের চলে। সেখানে জ্বল লাগলেই আগুনের মত জ্বলে ওঠে। কোন ওষুধ-বিষুধে কাজ হয় না।

চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। সেই সঙ্গে গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে শিশির পড়ার আওয়াজ। যদিও প্রথম রাতে শিশির তেমন পড়ে না। এর সঙ্গে বাতাস কেটে পাখার মত ঘুরতে ঘুরতে শিমুল ফুল পড়ার শব্দ। ভারী মিষ্টি সেই শব্দ। মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে পড়লে চমকে উঠি।

রাত তখন প্রায় ২টো। ঘড়ি ছিল না সঙ্গে। তাই সময় দেখার কোন সুযোগ ছিল না। কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী অথবা অষ্টমী তিথি হবে। এক টুকরো বাঁকা চাঁদ তখন প্রায় মাথার ওপর। নদীর ওপারে বাতাসে কোন ডাল বা ঝোপ নড়ে উঠলেই মনে হয় এই বুঝি কিছু এল। কোন শব্দ পেলেই চমকে উঠি। একবার একটা শুকনো ডাল ভাঙ্গার আওয়াজে এমন চমকে উঠেছিলাম যে তা আর বলার না।

অনেকটা আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি শিকারে বসে মানুষের মনের কি অবস্থা হয় তা বলা খুব কঠিন। এ সময়ে অনেক বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব মাথায় আসে। অনেক আগের পড়া কঠিন কঠিন বইএর তথ্য ও তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা খুঁজেও পাওয়া যায়। এ জন্যই হয়ত বড় বড় পণ্ডিতরা নির্জনতা ভালবাসেন।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সমস্ত বনকে উচ্চকিত করে বাঁ দিকে পর পর দুটো গুলির শব্দ হল। সমস্ত শরীর দিয়ে

তাড়িত প্রবাহ খেলে গেল। শিরদাঁড়া টান টান করে বসলাম। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর ঠিক আমাদের পেছন দিকে বাঁ দিকে প্রচণ্ড এক আওয়াজে মনে হল একটা মেলট্রেনের ইঞ্জিন ছুটে আসছে। ঝোপ ঝাড়, ডালপালা ভেঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে শব্দটা না থেমে শম্ভুদা আর কাকার দিকে চলে গেল। তারপর আবার সেই নিস্তব্ধতা।

বুঝতে পারলাম না কিসের আওয়াজ। শনিচারোয়াকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলাম। একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম যে, জানোয়ারটা যথেষ্ট ভারী অর্থাৎ বেশ বড় এবং পায়ে খুর আছে। সংক্ষেপে আলোচনা করে বুঝলাম ওটা সম্বর হরিণ ছাড়া আর কিছু না।

ক্রমে ভোর হল। পুব আকাশের প্রান্তদেশ ফিকে হয়ে এল। আগের রাতে ঠিক হয়েছিল প্রেসিডেণ্ট এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর আমরা শম্ভুদা এবং কাকাকে নিয়ে দাদাদের ওঠাব। কমপক্ষে সকাল ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে বনের নিচের দিকটা অন্ধকার থাকে আর আমরা যখন সন্তর্পণে যেতে থাকব তখন শিকারীদের ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া ভোর সকালে জানোয়াররা এদিক থেকে ওদিকে গভীর বনে ফিরে যায়। তাই গভীর রাতের মত ভোর বেলাতেও খুব সাবধানে থাকতে হয়।

নদীর ওপারে ঝোপের মধ্যে ম্যাও করে ময়ূর ডেকে উঠল। সেই সঙ্গে মোরগের ডাক। বেশ পালাপালি করে ময়ূর আর মোরগের ডাক ভেসে আসতে লাগল। শনিচারোয়া সাবধান করে দিল। এর আগেও দেখেছি অনেক সময় ময়ূর আর মোরগের ডাক মানেই বন্য জন্তু-জানোয়ারের অস্তিত্ব।

ক্রমে প্রেসিডেণ্টের আসার সময় হয়ে এল। আর কিছুই নজরে এল না। ঠিক এই সময়ে শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একটা ময়ূর উড়ে এসে বসল ঠিক মাথার ওপর শিমুল ডালে। কয়েক সেকেণ্ড পর পরপর তিনটি ময়ূরী। ঝুঁটি দুলিয়ে, লেজ ঝুলিয়ে ময়ূরটা বারবার ঘুরে, নদীর ওপারে ঝোপটার দিকে তাকাচ্ছিল।

শনিচারোয়া আমাকে বারবার ইঙ্গিত করছিল ময়ূরটাকে মারবার জন্য। অতি সন্তর্পণে বন্দুক থেকে এলি এ্যালকামাক্স এল জি বের করে এ্যালকামাক্স এক নম্বর শট ভরে নিলাম। অন্য ব্যারেলে স্ফেরিক্যাল বুলেট।

বন্দুক তুলে ওপর দিকে তাকালাম। একটা ময়ূরী তখন ময়ূরটার গা ঘেঁসে এসে বসেছে। ময়ূরটা তাঁর ঠোঁট ময়ূরীর পাখনার মধ্যে ডুবিয়ে চুলকে দিচ্ছে। আর ময়ূরী সাপের মত গলা বাঁকিয়ে মাথাটা নিচু করে আছে। কাছাকাছি হলে বুঝতে পারতাম চোখ দুটো বন্ধ কি না।

বন্দুকটা নামিয়ে নিলাম। শনিচারোয়ার চোখে প্রশ্ন। কিছুটা ভর্ৎসনা। আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না।

ওরা হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে কি যেন দেখল। তারপর সামান্য একটা কক্ করে আওয়াজ করে চারটি এক সঙ্গে যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকে উড়ে গেল।

রামের শীস্ শুনতে পেলাম। পরিচিত কেউ। জবাব দিলাম। কয়েক মুহূর্ত পর ওরা এসে হাজির হল।

দুজনের চেহারাই বিধ্বস্ত, বিস্রস্ত প্রায়। প্রৌঢ় প্রেসিডেণ্টের পুরানো জ্যাকেটের বোতাম প্রায় একটাও নেই। একটা বোতামের ঘর অনেকটা ছিঁড়ে গেছে। প্যাণ্টের গোড়ার দিকটাও ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। রামের অবস্থাও তথৈবচ। এমনিতেই ওর জামাটা ছিল পুরানো। ওর জামাটা এবং পরণের ধুতিটাও ছিঁড়ে ফালা ফালা। আস্ত আছে শুধু কালো কম্বলটা। কিন্তু সেটা মাটি আর কাদায় মাখামাখি। রক্তেরও ছিঁটেফোঁটা ছিল।

দুজনে হাঁফাচ্ছিল। তখনো ওরা উত্তেজিত। ঘটনাটা যা বলল তা ভয়াবহ।

ওরা বসেছিল একটা মাঝারি ধরনের খয়ের গাছের নিচে একটা উই ঢিবির আড়ালে। ওদের পাশেই ছিল ছোট নালার মত যাতায়াতের রাস্তা। রাস্তাটা বারবার যাতায়াতে নালার রূপ নিয়েছিল। নেহাৎ খুব ছোট জানোয়ার না হলে উই ঢিবি থেকেই গুলি করা যেতে পারে।

ওদের কথায় জানা গেল আকাশে চাঁদ উঠলে ওরা দেখতে পায় একটা জানোয়ার ওপারে জলের ধারে,—বোধহয় জল খাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই ওরা জানোয়ারটার আভাস পেয়েছিল। এপারে আসবার জন্য যখন ওটা জলে নামল তখন বুঝতে পারল বেশ বড় এবং ভারি কোন কিছু হবে। ঠিক ধারণা করতে পারে নি কি ওটা? নদী পার হওয়ার জায়গায় একটা গাছের ছায়া পড়েছিল বলে স্বল্প আলোয় কিছুই বোঝা যায় নি। নদীর এপারে ওঠার আগেই দুজনেরই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় ওটা সম্বর ছাড়া আর কিছু না। তাই

দুজনেই তাদের এক নালা বন্দুকে এ্যালকামাক্স এল জি পুরে তৈরী হল।

নদীর এপারে জানোয়ারটা—ওঠা মাত্র দু'জনেই একসঙ্গে গুলি চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা থমকে দাঁড়াল। প্রেসিডেণ্ট অন্ধকারেই গুলি ভরবার জন্য বন্দুকের ভাঁজ ভাঙ্গলেন আর রাম ওটার গায়ে টর্চ ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটা এদিকে তাকাল।

সবিস্ময়ে, সভয়ে এরা দুজনে দেখতে পেলেন যাকে নিরীহ সম্বর বলে ধরে নিয়েছিলেন সেটা সম্বর না। প্রকাণ্ড এক মদ্দা বাইসন।

লাইট চোখের ওপর পড়া মাত্র বাইসনটা লাল চোখ মেলে ওদের দিকে তাকাল। চোখে মূর্তিমান বিভীষিকা। নাকের মধ্যে একটা হিংস্র আওয়াজ করে ওদের দিকে তেড়ে এল প্রচণ্ড গতিতে।

আর সময় ছিল না। রাম টর্চ মেরে বাইসন দেখেই ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিল। চোখের পলকে বন্দুক, কম্বল ফেলে খয়ের গাছের নীচু একটা ডাল ধরে ঝুলে ওপরে উঠে পড়েছে। প্রেসিডেণ্টও বন্দুক ফেলে হাঁচোর পাঁচোর করে গাছের ওপর উঠে পড়েছেন। নালা থেকে বাইসনটার উঠতে যে-কয়েক সেকেণ্ড সময় বেশী লেগেছে তার মধ্যেই ওরা জীবন বাঁচাতে পেরেছে।

বাইসনটা গাছের নিচে ধেয়ে এল। কম্বলটার ওপর দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে তারপর হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করে আমাদের দিক পানে। ভয়ে ওরা সারারাত আর গাছ থেকে নামে নি। ছোট গাছটার ওপর সরু দুটো ডালের ওপর দুলতে দুলতে কোন মতে রাত কাটিয়েছে।

কম্বলটায় যে রক্তের ফোঁটা দেখা গেছে তা ঐ বাইসনের। বাইসনের পায়ের চাপে প্রেসিডেণ্টের বন্দুকের কুদোঁর মাঝখানটা ভেঙ্গেই গেছে।

আমরা আর দেরী করলাম না। ফ্লাক্স থেকে ওদের দুজনকে চা দিলাম। এতে শীতের কাঁপুনি একটু কমবে। প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিলেন শম্ভুদা ও কাকা। আমরা সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। বাইসন যে রাস্তা ধরে গেছে সেই রাস্তা ধরেই।

শম্ভুদা ও কাকা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ওঁরাও বাইসন চলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছেন। ওদের থেকে মাত্র গজ পঁচিশেক দূর দিয়ে ওটা চলে গেছে।

আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রায় তিন পো পথ ভাটিতে মনিদা আর মেজদা। প্রেসিডেণ্ট বললেন বাইসনটা ঐ পথেই পালাবে। কারণ মেজদারা যেখানে বসেছেন তার একটু দক্ষিণেই আছে ফরেস্টের কাঁটা-তার ঘেরা নার্সারি। ওদিক দিয়ে তো আর ওর যাওয়ার জায়গা নেই, তাই দাদাদের পাশ দিয়েই ওকে নদী পার হতে হবে।

খুবই সন্তর্পণে যেতে হচ্ছে। দাদাদের পাশ দিয়ে গেলে নিশ্চয়ই তাদের রাইফেলের আওতায় পড়বে জন্তুটা। যদি অন্য দিকে পালিয়ে না যায়। দাদাদের রাইফেলের আওয়াজ যখন আমরা শুনতে পাই নি তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে বাইসনটা অন্য পথে পালিয়েছে অথবা কোন ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। ক্লোজ রেঞ্জে এ্যালকামাক্স এল জি'র আঘাত করার ক্ষমতা খুব বেশী এবং দুটো গুলিই তার গায়ে লেগেছে। যদি ঠিক মত লেগে থাকে তবে আঘাত খুবই গুরুতর। হয়ত এতে মারাও যেতে পারে। আবার যদি ঠিক মত গুলি না লেগে শুধু ওপর ওপর আঘাত করে থাকে তবে এতক্ষণে ও মূর্তিমান বিভীষিকা তৈরী হয়েছে সন্দেহ নেই।

মনিদা এবং দাদার অবস্থান আমি ঠিক মত বুঝতে না পারলেও প্রেসিডেণ্ট দেখিয়ে দিলেন। দূরে একটা লালী গাছ দেখিয়ে বললেন, ওখানে ওরা আছে!

একটু এগিয়ে যেতে একটা আওয়াজে থমকে গেলাম। ঝোপের আড়ালে কেমন চাপা গরগর ধ্বনির মত আওয়াজ।

বাইসন বাঘের মত আওয়াজ করে বলে আমাদের ধারণা ছিল না! বুঝতে পারলাম ঝোপের আড়ালে ওটা দাঁড়িয়ে আছে আর আমাদের আওয়াজ পেয়ে ওধরনের আওয়াজ করছে। হয়ত ওর নাকে গুলি লেগেছে ফলে রক্তে নাসারন্ধ্র জমাট বেঁধে গেছে এবং সেই কারণে ওর মুখনিসৃত আওয়াজ ওধরনের হচ্ছে।

কিন্তু ওখানেই তো দাদাদের থাকার কথা। তাহলে কি ওরা বাইসনের ভয়ে পালিয়ে গেছেন? নাকি—আচমকা বুকটা কেঁপে উঠল ভয়ে। এমনও তো হতে পারে যে সরাসরি বাইসনটা ওদের চমকে দিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ে! তাহলে?

তিনটি উদ্যত বন্দুক নিয়ে আমরা অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুতে থাকি। সামান্যতম আওয়াজও আমরা অবহেলা করছি না। সামান্য সবুজ রঙের ছোট্ট মউ পাখী সামনের ডালে নেচে উঠলেও আমরা তাকে লক্ষ্য করছি। আমরা ঠিক করে নিলাম যে, বাইসনটার দেখা পাওয়া মাত্র

তিন জনে এক সঙ্গে গুলি চালাবি। তারপর যা হয় হবে!

এরপর একটা ঝোপের ব্যবধান। সেই সঙ্গে নল-খাগড়া আর হোগলা বনের পাতলা বেড়া। ওর আড়ালেই তো দাদাদের থাকার কথা।

কাছাকাছি এসে কেমন খটকা লাগল। আওয়াজটা খুব চেনা। অত্যন্ত পরিচিত। আমরা বন্দুকের নল দিয়ে সামনের ঝোপটা ঠেলে দিতেই মাঝখানটা নজরে এল।

নলখাগড়া আর হোগলার গদীর ওপর কম্বল পেতে গুটি সুটি মেরে মনিদা আর মেজদা অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। রাইফেলটা দু'জনের মাঝখানে পাশ বালিশের মত হয়ে আছে। একটা তিন আর একটা পাঁচ সেলের টর্চ দু পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

রাগে গা রি রি করে উঠল। বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা মনে করে রাগ হওয়া স্বাভাবিক! অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা কয়েক মুহূর্ত হতবাক হ'য়ে গেলাম। তারপর ছ'জনে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লাম। আমরা তখন সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছি যে তখন আমরা তরাই-এর এক গভীর বনের অভ্যন্তরে। আশে-পাশে অনেক হিংস্র জানোয়ার থাকার সম্ভাবনা। আর আহত এক বাইসনের অস্তিত্ব তো আছেই।

দাদারা ধড় মড়িয়ে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দুজনেই কিছুটা অপ্রস্তুত।

ঘটনাটা ধীরে ধীরে জানা গেল। বারোটা নাগাদ মনিদা মেজদাকে বলেন দুটো পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে নেবেন। এই সময়টা মেজদা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে জেগে থাকবেন। দুটার পর মেজদা ঘুমাবেন আর মনিদা জেগে থাকবেন। যুক্তিমত মনিদা অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মেজদা জেগে রইলেন।

আধ ঘণ্টা খানেক পর তিনিও মনিদার পাশে গড়িয়ে পড়লেন। আর একঘুমে রাত কাবার।

কম্বলের ওপর সবাই বসে চা খেতে খেতে আবার পুরো ঘটনা বলা হল। মেজদারা কোন কিছুই টের পান নি। এমন কি গুলির আওয়াজও না। চা খেয়ে আমরা চারপাশ ট্র্যাকিং করতে আরম্ভ করলাম। কারণ আহত বাইসন আহত বাঘের চাইতে নেহাৎ কম না।

প্রেসিডেণ্টের কথাই ঠিক। মনিদাদের পাশের রাস্তা ধরেই বাইসনটা নদী পার হয়েছে। অল্প জল দেখে জুতো পায়েই নদী পার হলাম সবাই। বাইসনটা নদী পার হয়ে এলোমেলো ভাবে হেঁটেছে কিছুটা। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়েছে বোঝা গেল! তারপর গভীর বনের ভেতর প্রবেশ করেছে।

সরকারী ফরেস্টে আমাদের ঢোকার পারমিট ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম। ঠিক হল ঐ দিনেই মনিদা ফী সহ লোক পাঠাবেন ফরেস্ট অফিসে, জলপাই-গুড়িতে। পারমিট এসে গেলে পরদিন সকালে লাশ খুঁজতে বের হব। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট এদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

সেদিন আর লোক পাঠান হয় নি। আমাদের খেয়াল ছিল না যে সেদিন ছুটি। ঠিক হল পরদিন লোক পাঠান হবে এবং সেক্ষেত্রে তার পরদিন আমরা বনে ঢুকব।

তা আর শেষ পর্যন্ত করতে হয় নি। পরদিন সকালে প্রেসিডেণ্ট লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, বাইসনটা মারা পড়েছে। কিছু ফরেস্ট গার্ড ওর দেহটা খুঁজে পেয়েছে মাইল দুয়েক ভেতরে একটা নালার ধারে। হায়না আর শেয়াল এবং অন্যান্য জন্তু (শুয়োর, সজারু চিতা) ওকে খেয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ওদের কথায় জানা যায় গুলি লেগেছিল শিং এবং কানের মাঝ-খানে একটা, অন্যটা মাথার পেছনে।

বাইসনের একটা শিং ভেঙ্গে যায়। এক শিং মাথার খুলিটা প্রেসিডেণ্ট তাঁর বাড়ীতে এনেছিলেন। অনেক দিন পরও সেটা আমি দেখেছি।

আজ মাঝে মাঝে ভাবি বাইসনটার কানে গুলি লেগেছিল বলেই সে সময়ে কানে খাটো হয়ে যায়। ফলে দাদাদের নাকের ডাকের প্রতিযোগিতা শুনতে পায় নি। পেলে হয়ত মিউজিক্যাল চেয়ারের মত এক ছুটে গিয়ে ওদের ওপর বসে পড়ত। এবং তখন কী হত?

অভীক হালদারের ধারাবাহিক বড় গল্প

য়ুয়াঙ-চোয়াঙ

চৈত্র মাস মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যকিরণে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে।

গৌড় কেশরী সম্রাট শশাঙ্কদেবের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ থেকে যে রাজপথটি তাম্রলিপ্তের মধ্য দিয়ে সোজা দাক্ষিণাত্যের দিকে প্রসারিত হয়েছে সেই পথে ছুটে চলেছে এক নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী। গৌড়বঙ্গের অন্য প্রধান রাজপথটি অর্থাৎ যেটি তাম্রলিপ্ত হয়ে চম্পারাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথটি সেটির মত প্রশস্ত ও জনপদবহুল নয়। এই পথটির অনেকাংশই নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে গেছে।

এদিককার বনভূমিতে হিজলগাজের ছড়াছড়ি। এ ছাড়াও পিয়াশাল, গাব ও মহুয়া গাছ ঝুঁকে পড়েছে পথটির উপর, ফলে পথটি ছায়াছন্ন ও শীতল।

অশ্বারোহীর বয়স আঠারোর বেশি নয়। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। দেহ দৃঢ়সংবদ্ধ। ঈষৎ বাদামী চোখ। কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারী। অশ্বারোহীর নাম বিজয়।

একটি সুউচ্চ গাব গাছের নিচে বিজয় অশ্বের গতিরোধ করল। বাহন ও অশ্বারোহী দুই-ই পরিশ্রান্ত।

বিজয় অশ্বের গলায় ঝোলানো চর্ম পেটিকার ভিতর থেকে খই ও সোনালী ইক্ষুরস নিসৃত গুড় বের করল। অদূরেই একটি নিকষ কালো শিলাপট্ট। বিজয় শিলাপট্টের উপর উপবেশন করে ওগুলি গলাধঃকরণে প্রবৃত্ত হল।

দণ্ড কাল পরে পিছনের রাস্তাটি যেখানে অকস্মাৎ বাঁ দিকে বাঁক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখান থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল এক চৈনিক বৌদ্ধ শ্রমণকে। শ্রমণটির মুখ প্রশান্ত, ঠোঁটে স্মিত হাসির অস্পষ্ট আভাস। পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। উজ্জ্বল পীতাভ রঙ শ্রান্তিতে ঈষৎ রক্তাভ। ভক্ষণরত বিজয়কে দেখে তার চোখ সামান্য উজ্জ্বল হ'ল।

তিনি বিজয়ের কাছে এগিয়ে এলেন,- যুবক, আমি পথক্লান্ত। আমাকে জল দিতে পারো ?

তাঁর উচ্চারণে সামান্য বিদেশী টান।

বিজয় সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে চর্ম পেটিকাটিকে এগিয়ে দিল। আকণ্ঠ জলপান করে শ্রমণটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—ভগবান তথাগত তোমার মঙ্গল করুন বৎস।

বিজয়ের খাওয়াও শেষ হয়েছিল। সে বাঁ হাতে অশ্বের লাগাম ধরে পথে এগোতে এগোতে জিজ্ঞাসা করল,—আপনার গন্তব্যস্থল কোথায় ?

শ্রমণ বললেন,—আমাকে যেতে হবে লো, টো, মা, চিহ বৌদ্ধ বিহারে।

বিজয় সামান্য অবাক কণ্ঠে বলল,—আপনি কি কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের কথা বলছেন ? কারণ তা ছাড়া তো এ অঞ্চলে আর কোন বড় বৌদ্ধ বিহার নেই।

শ্রমণ বললেন,—তুমি ঠিকই ধরেছ বৎস। চীনা ভাষায় রক্তমৃত্তিকা বিহারের নাম লো, টো, মা, চিহ। আমাকে যেতে হবে সেখানেই।

বিজয় অবাক হয়ে বলল,—কিন্তু সে তো এখনো বহুদূরের পথ। অশ্বপৃষ্ঠে গেলেও সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো অসম্ভব। আমারও গন্তব্যস্থল কর্ণসুবর্ণ। আমি অত্যন্ত জরুরী কার্যে সেখানে যাচ্ছি। আগামীকাল আমাকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার পিছনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে পারেন।

শ্রমণের মুখে স্বস্তির ছায়াপাত ঘটল। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন,—তথাগতের করুণা তোমার উপর বর্ষিত হোক।

তারপর তিনি অত্যন্ত সহজভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। বিজয় ইতিমধ্যেই অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসেছে। মুহূর্তের মধ্যে সামান্য হাতের ছোঁয়ায় শিক্ষিত অশ্ব বায়ুবেগে ছোটে সম্মুখ পানে।

চলার পথেই পরিচয় আদান প্রদান হয়ে গেল দুজনের।

শ্রমণের নাম য়ুয়াঙ চোয়াঙ। নানকিং বৌদ্ধবিহারের অধ্যাপক। ভারতে এসেছেন ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থক্ষেত্র ও প্রধান প্রধান বিহারগুলি পরিভ্রমণ করতে এবং সেইসঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি বিবরণীও তিনি তৈরি করবেন।

যেতে যেতেই য়ুয়াঙ চোয়াঙ বললেন, তুমি বলছ শশাঙ্কদেবের সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করা তো সহজ নয়। শুনেছি ভুক্তি অধিষ্ঠান অধিকরণ থেকে রাজসভায় প্রবেশের জন্য চিহ্নিত মুদ্রা দেওয়া হয়। চিহ্নিত মুদ্রা ব্যতিত সাধারণ লোকের রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ।

বিজয় সামান্য অপ্রতিভ হল। একথা তার জানা ছিল না। সে কোন কথা না বলে অশ্বের গতি সামান্য বৃদ্ধি করল।

শ্রমণ অল্প হেসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর বললেন,—তুমি বিশ্বাস করতে পারো আমাকে। এ ব্যাপারে আমি হয়তো তোমার সাহায্যে আসতে পারি। তার আগে তোমার কথা শুনতে চাই।

বিজয় পিছন ফিরে চকিতে দেখে নিল একবার শ্রমণকে। য়ুয়াঙ চোয়াঙ সবিস্ময়ে দেখলেন কিশোরের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন,—অবশ্য তোমার যদি কোন গোপনীয়তা থাকে এ ব্যাপারে, তাহলে বলবার দরকার নেই। বিজয় দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—না, শ্রমণ। বুঝতে পারছি আপনার সাহায্য আমার দরকার হতে পারে। আপনাকে সব কথাই বলা দরকার। এ ব্যাপারে কোনো গোপনীয়তার অবকাশ নেই।

তখনও রোদ্দুর ঝকমক করছে বনভূমির ভিতর। দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুর শব্দ ছাপিয়ে বিজয়ের বলা শুরু হল শ্রমণের কাছে।

বিজয়ের কথা

আমার নাম বিজয়গুপ্ত। আমরা দণ্ডভুক্তির বাসিন্দা। আমার বাবা ব্রহ্মসেন ছিলেন পূর্বোক্ত উত্তরাপথ সম্রাট মহাসেনগুপ্তর একজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর। তাঁর সঙ্গে মহাসেনগুপ্তর একটা ক্ষীণ সম্পর্কও ছিল সম্ভবত। তাঁর সঙ্গে যখন লৌহিত্যতীরে (ব্রহ্মপুত্র) কামরূপরাজ সুস্থিত বর্মার তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল তখন আমার পিতা সেই যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পিতা তাঁর একটি পা হারান। মহাসেনগুপ্ত তাঁর উপর অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি তাঁকে দণ্ডভুক্তির ভুক্তি-অধিকর্তা করে পাঠান। পরবর্তীকালে শশাঙ্কদেব, যিনি ছিলেন মহাসেনগুপ্তর প্রধান সামন্তরাজ, তাঁর বাহুবলে গৌড় বঙ্গর স্বাধীন সীমারেখা বিস্তৃত হয় মগধ থেকে কামরূপ পর্যন্ত।

তিনিও আমার পিতাকে সম্মান করতেন।

কিন্তু এই সময় আমাদের মাথার ওপর ঘনিয়ে আসে বিপদের কালো ছায়া। সোমদত্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন পিতার প্রধান সচিব। সে ও তার বন্ধু গঙ্গদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল আমার নিরপরাধ পিতার বিরুদ্ধে।

আপনি বোধহয় জানেন, শশাঙ্কদেবের সঙ্গে বর্তমান কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার ভীষণ শত্রুতা। গৌড়বঙ্গের সমৃদ্ধিতে ভাস্করবর্মা ঈর্ষান্বিত। তার উদ্দেশ্য যে কোন প্রকারেই হোক গৌড়বঙ্গ অধিকার করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন ভুক্তির শাসনকর্তার কাছে গোপনে প্রস্তাব পাঠান তাঁকে গোপনে সাহায্য করার জন্য। আমার পিতা ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এরপর ভাস্করবর্মা গোপনে যোগা-

যোগ করেন সোমদত্তের সঙ্গে। তাঁর প্ররোচনায় সোমদত্ত ও গঙ্গদেব এক জাল চিঠি বানায়। পরে পিতা যখন কার্যোপলক্ষে সুহ্ম দেশে যান, তখন তারা এই চিঠিটি পিতার নামে মুদ্রাঙ্কিত করায়। এই চিঠিতে লেখা ছিল পিতা গোপনে ভাস্করবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ভাস্করবর্মার বঙ্গবিজয়ের পর পিতার কি কি কাম্য তাই লিখে পাঠিয়েছেন। এই সাংঘাতিক চিঠিটি তারা সোজা শশাংকদেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে তৎক্ষনাৎ মহারাজ শশাঙ্কর রাজকীয় আস্তাবলে পিতাকে কর্মচ্যুত করা হয় এবং তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করা হয়।

আমি বহুকষ্টে তাঁকে নিয়ে এক গুপ্ত জায়গায় নিয়ে যাই। সেখানেই তিনি এখন অবস্থান করছেন। অপরদিকে সোমদত্তকে পিতার জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছেন মহারাজ শশাঙ্ক। আর গঙ্গদেব হয়ে বসেছেন প্রধান সচিব।

সর্বত্র গুপ্তচররা বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁরা খুঁজছে আমাকেও। লজ্জায় ও ঘৃণায় পিতা খাদ্য স্পর্শ করছেন না। তাঁকে বহুভাবে প্রবোধ দিয়ে আমি কর্ণসুবর্ণর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। আমার একমাত্র শপথ পিতাকে নিরাপরাধ প্রতিপন্ন করা। তাঁর কলঙ্ক-মোচন করা।

একটানা বলে বিজয় থামলো। বিকেলের ছায়া তখন নেমে আসছে অরণ্যপথের উপর।

লো, টো, মা, চিহ বিহার

বিজয় তাকিয়েছিল উত্তর দিকে যেখানে অরণ্য পথটি অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে এক বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গেছে। অনেক দূরে চিক চিক করছে ভাগীরথীর জল।

শেষ বিকেলের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ত্রিতল বিরাটাকৃতি এক স্তূপ। স্তূপটি মূল রাজপথ থেকে কিছুটা ভেতরে। ভাগীরথীর ধারেই বলা যায়।

বিজয়ের ঘোড়া বেশ পরিশ্রান্ত। তাই বিজয় তাকে বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

য়ুয়াঙ-চোয়াঙ এসে দাঁড়ালেন বিজয়ের পাশে। তারপর বললেন,—ঐ স্তূপটিই হল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। সুদূর চীন পর্যন্ত এর খ্যাতি সুবিস্তৃত। তবে তাম্র-লিপ্তর বৌদ্ধরা আমাকে বলেছে শৈব ধর্মাবলম্বী মহারাজ শশাঙ্ক নাকি এই বিহারকে ভালো চোখে দেখছেন না।

বিজয় অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল,—বাঙালী জাতি যথেষ্ট উদারপন্থী। মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর কোন অত্যাচার করতে পারেন এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

বিজয়ের কথা শেষ হবার আগেই সহসা দ্রুত অশ্ব-ক্ষুরাঘাত শোনা গেল। সচকিত হয়ে তাঁরা সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন দুটি অশ্বারোহী তীব্রবেগে তাঁদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অশ্বারোহীদের আঙরাখা ঘামে ভিজে গেছে। এদেরও মূল গন্তব্য রক্তমৃত্তিকা বিহার। দেখতে দেখতে তারা দূরে মিলিয়ে গেল।

য়ুয়াঙ-চোয়াঙ বললেন বিজয়কে,—তুমি অত্যন্ত সাবধানে থাকবে। অন্তত যতদিন মহারাজের সঙ্গে দেখা না হচ্ছে আমি তোমার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু ততদিন তুমি গুপ্তভাবে অথবা ছদ্মবেশে অবস্থান করবে। এখানে তোমার সঠিক পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

বিজয় এবং য়ুয়াঙ-চোয়াঙ যখন বিহারের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকাশে তারা ফুটেছে যুঁই ফুলের মত। বিহারের ভিতর থেকে সান্ধ্য উপাসনার ধ্বনি ভেসে আসছে। সামনে শোনা যায় ভাগীরথীর কলধ্বনি।

বিজয় অশ্বের গতিরোধ করায় ছায়ার মতো বেরিয়ে এল এক তরুণ ভিক্ষু। সামান্য অন্ধকারে তার গৈরিক বস্ত্র ঝক মক করছিল।

সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে সে য়ুয়াঙ-চোয়াঙকে বলে, —রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে আচার্য। মহাচার্য মনিপদ্ম আপনার প্রতীক্ষায় আছেন।

তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকালো বিজয়ের দিকে। য়ুয়াঙ-চোয়াঙ বললেন,—আমার পথের সঙ্গী। উচ্চ বংশজাত এই ছেলেটির গন্তব্য কর্ণসুবর্ণ।

তরুণ ভিক্ষুটি মৃদু হেসে বিজয়ের দিকে ঘুরে বলল,—আর্য, আপনিও আপনার অশ্ব পথশ্রমে ক্লান্ত। আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুণ।

সংঘভূমিটি ত্রিতল। প্রধান তোরণ পার হয়ে একটি বিস্তৃত উদ্যান। চারপাশে বিদ্যার্থী এবং তরুণভিক্ষুদের প্রকোষ্ঠ। দুই দিক দিয়ে দুটি সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতল ও ত্রিতলে। দ্বিতলে আচার্য ও অন্যান্য বয়স্ক ভিক্ষুদের অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠগুলি।

ত্রিতলে একটি বিস্তৃত উপাসনা গৃহ। উপাসনা-

গৃহটি কারুকার্যময় পাথরের তৈরি। উপাসনা গৃহের সঙ্গেই লাগোয়া একটি প্রকোষ্ঠ মহাচার্য মনিপদ্মের।

মহাচার্য মনিপদ্মের বয়স প্রায় সত্তর বছর ছবে। পাকা গমের মত উজ্জ্বল রঙের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বয়সের।

তাঁর খ্যাতি শুধু গৌড়েই সীমাবদ্ধ নয়। মগধ, চম্পারাজ্য ছাড়িয়ে তা সারা উত্তরাপথে বিস্তৃত। তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠটি রাশি রাশি ভুর্জপত্রের পুঁথিতে পূর্ণ।

বিজয় ও য়ুয়াঙ-চোয়াঙ যখন তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে উপবেশন করলেন, তখনও মহাচার্য শিলাপট্টের ওপর একটি প্রাচীন বৌদ্ধপুঁথির ওপর ঝুঁকে পড়ে কূট প্রশ্ন মীমাংসায় ব্যস্ত ছিলেন।

য়ুয়াঙ-চোয়াঙকে দেখে তাঁর ধূসর মুখে প্রশান্তির ছায়া পড়লো। হাস্যোজ্জ্বল মুখে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি য়ুয়াঙ-চোয়াঙকে।

এখানেও বিজয়ের মূল পরিচয় উহ্য রাখলেন য়ুয়াঙ-চোয়াঙ। কথা প্রসঙ্গে মহাচার্য জানালেন, মহারাজা শশাঙ্কদেব বর্তমানে বৌদ্ধদের ওপর কিছুটা বিরূপ হয়েছেন। বৌদ্ধবিহারগুলির কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা যেগুলি মহাসেনগুপ্তের আমল থেকে চলে আসছে, সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি।

বিজয় দেখলো, প্রদীপের ম্লান আলো মহাচার্যের মুখের একপাশে পড়েছে। তাতে গভীর বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও।

য়ুয়াঙ-চোয়াঙ বললেন,—আমার সঙ্গে যখন দেখা হবে সম্রাটের, তখন আমি তাঁকে আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাবো এই বিষয়ে। মহারাজ শশাঙ্ক ধীর ও প্রজাবৎসল। আমার দীর্ঘ যাত্রাপথের সর্বত্রই তাঁর প্রশংসাধ্বনি শুনতে শুনতে এসেছি, এমনকি তাঁর শত্রুদের কাছ থেকেও। সারা গৌড়বঙ্গাল জাতিকে নবরূপে গঠন করেছেন তিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমার কথা রক্ষা করবেন।

—আমি জানি আচার্য। মহারাজ আসলে ধীর ও উদারচেতা। কিন্তু ইদানিং তাঁর চারপাশে ভীড় জমিয়েছে কিছু স্তাবক ও ধর্মের ভেকধারী কিছু শৈব। তারাই এখন মহারাজের প্রধান পরামর্শদাতা। ফলে তিনি তাঁর স্বভাববিরোধী কিছু কাজ করছেন। এদিকে পশ্চিম সীমান্তে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অব্যাহত। এই সুযোগে তাঁর চিরশত্রু কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা নানা চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে। গৌড়বঙ্গের স্বাধীনতা ভগবান তথাগত রক্ষা করুন।

মহাচার্য্য মনিপদ্ম চুপ করলেন। বিজয়ের মনে হল যেন দৈববানী শুনলো। তার কেবলই মনে হতে লাগলো একরাশ কালো অন্ধকার শুধু তার দিকেই নয়, সারা গৌড়বঙ্গের দিকে ছুটে আসছে।

আপনারা আজ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত। আপনারা আজ বিশ্রাম করুন।—মহাচার্য নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার মত এসে দাঁড়ালো সেই তরুণ ভিক্ষুটি যে তাঁদের নিয়ে এসেছিল এখানে। য়ুয়াঙ-চোয়াঙ গাত্রোত্থান করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—কৌতূহল মার্জনা করবেন মহাচার্য। মহারাজ শশাঙ্কর চারপাশে যে চক্রের সৃষ্টি হয়েছে বললেন তার প্রধান চালক কে ?

মহাচার্য কিছুক্ষণ চিন্তাকুল নয়নে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। তারপর পরিষ্কার নির্দ্বিধ কণ্ঠের উত্তর এলো,—দণ্ডভুক্তির প্রধান সচিব গঙ্গদেবের খুল্লতাত মহাসচিব অনন্তদেব।

চক্রান্তের জাল

তরুণ ভিক্ষুটির নাম বিনয়ভদ্র। নামকরণটি সার্থক-বিজয় ভাবলো। সত্যিই সে যেমন বিনয়ী আর তেমনই ভদ্র। বিনয়ভদ্র বিজয়কে নিয়ে এলো দ্বিতলের এক প্রকোষ্ঠে। বহিরাগত অতিথিদের জন্যই প্রকোষ্ঠটি। ভিতরে অনাড়ম্বর দারুনির্মিত শয্যার উপর পরিষ্কার বস্ত্র-খন্ড পাতা। কুলুঙ্গিতে মৃৎপ্রদীপ।

আপনার হয়তো কষ্ট হবে আর্য। আপনি উচ্চ-বংশজাত সন্তান। অতিথি প্রকোষ্ঠগুলিতে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা করতে পারিনি আমরা।—সসঙ্কোচে বিনয় ভদ্র জানালো।

না না কষ্টের কিছুই নেই। এতো চমৎকার ব্যবস্থা। বিজয় বললো তাড়াতাড়ি।

আসলে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। সারাদিন পরিশ্রম গেছে প্রচুর। তাছাড়া উদ্দাম ঘটনাপ্রবাহ তার মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে রেখেছিলো।

য়ুয়াঙ-চোয়াঙ মহাচার্যের ঘর থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আচার্যদের প্রকোষ্ঠে। অর্থাৎ দ্বিতলের অন্য প্রান্তের প্রকোষ্ঠগুলিতে। বিনয়ভদ্র প্রদীপের শিখাটি উসকে দিল তারপর বলল,—আমাকে এখন যেতে হবে। আরও দুজন অতিথি এসেছেন আজ। তাঁরাও কর্ণসুবর্ণ

যাবেন"; এসেছেন সমতট থেকে। চেহারা দেখে মনে হয় তাঁরা সেনাবাহিনীর লোকজন হবেন।

বিনয়ভদ্র বিদায় নেবার পর বিজয় দারুশয্যায় শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল শুধু। য়ুয়াঙ-চোয়াঙের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয়। বড় ভালো মানুষটি। অপরের দুঃখে তাঁর হৃদয় সাড়া দেয় সব সময়। তথাগতর একজন প্রকৃত শিষ্য।

মহাচার্য মনিপদ্মের কথাগুলোও কানে বাজছিল বিজয়ের। তার অনুমানই ঠিক। মহারাজ শশাঙ্ক কেন তার পিতাকে কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই কর্মচ্যুত করলেন তার কারণ তাহলে সেই শয়তান গঙ্গদেব আর তার খুল্লতাত অনন্তদেব। অথচ এমন সময়ে, যখন গৌড় বাংলার চারিদিকে বিপদের কৃষ্ণমেঘ ঘনায়মান। বিজয়ের মনে পড়লো, তার বাবার কথা। হতভাগ্য বৃদ্ধ কি এখনও অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছেন?

তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায়। অতল ঘুমের অন্ধকার থেকে বিজয় জেগে উঠলো হঠাৎ। তার সতর্ক এবং সজাগ কানে ধরা পড়েছে অস্বাভাবিক কিছু।

কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলো সে। অকস্মাৎ অসম্ভব গরম লাগছে তার।

বিজয়ের মনে হল দূর থেকে কাদের সতর্ক কথা-বার্তার গুঞ্জন ভেসে আসছে।

ধীরে ধীরে বিজয় এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা সামান্য ফাঁক করতেই থমকে গেল সে!

আজ বিকালের দেখা সেই অপরিচিত অশ্বারোহী দুজন হেঁটে চলেছে দ্রুতপায়ে সামনের প্রশস্ত চাতালটার দিকে। নিস্তব্ধ চরাচরের বুকে, দূরে দক্ষিণ-দিকে ভাগীরথীর উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি ভেসে আসছে। আরও দূরে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির ভিতর থেকে বেরিয়ে রাজপথটি উত্তরে সোজা কর্ণসুবর্ণের দিকে চলে গেছে। লোক দুজন তন্ময় হয়ে নিজেদের মধ্যে নিচুগলায় কথা বলছে।

চাতালটা খুব দূরে নয়। বিজয় সামান্য দরজা ফাঁক করেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল সবকিছু। লোক দুটি সোজা চাতালে উঠে তাদের ঢিলে আঙরাখার আড়াল থেকে বার করল দুটি মশাল। বিজয় বিস্ময়াভিভূত চোখে দেখলো, তারা মশাল দুটি ধরিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে চক্রাকারে ঘোরাতে লাগলো বিভিন্নভাবে।

মুহূর্তে বিজয় ঠিক করে নিল কি করবে সে। এক টুকরো ছায়ার মত বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। তারপর পাথরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে চাতালের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

চাতালের কাছেই একটি শিলাস্তম্ভ। এখান থেকে চাতাল এবং সংঘভূমির সামনের এক বিস্তীর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই রাত্রে অবশ্য দূরে জমাট বাধা অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

বিজয় তাকিয়েছিল দূরের সেই জমাট বাধা অন্ধকারের দিকে। নিঃসন্দেহে লোকদুটি কোন গুপ্ত-সংকেত পাঠাচ্ছে কারো কাছে।

কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বিজয় দেখলো অনেক দূরে জমাট অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্ফুট ক্ষীণ আলোক রেখা কেঁপে কেঁপে দূরে সরে যাচ্ছে, কখনো বা কাছে আসছে। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্র যেন দুলছে এদিক ওদিক।

লোকদুটি এবার বেশ নিশ্চিন্ত হল। সামান্য পরেই তারা মশাল নিভিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে দূরের সেই রহস্যময় আলোটিও অদৃশ্য।

লোক দুটি চাপা গলায় কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। লোক দুটির মধ্যে লম্বা লোকটি বলল,—থাক। শেষ পর্যন্ত সংকেত পাঠানো গেছে। আমার তো ভয় হয়েছিল ওরা কেউ আসেনি।

—আমি জানতাম ওরা আসবেই। অনন্তদেব অত কাঁচা লোক নন।

—তাহলে কাল সকালেই আমরা কর্ণ সুবর্ণে ঢুকতে পারি?

—তাতো বটেই। আমাদের কাজ তো পরশু দিন। কাজকর্ম ভালোয় ভালোয় চুকলে বাঁচি।

—সেনাপতিরা কেউ শহরে নেই। সবাই সীমান্তে লড়ছে হর্ষবর্ধনের চতুরঙ্গ বাহিনীর সঙ্গে। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর আসবে না।

—এই শর্মার হাত দেখেছো কোনদিন বিফল হতে! দেখবে পরশুদিন তীরের খেলায় কি করি।

উভয়েই এরপর চাপা গলায় হাসলো তারপর লুকিয়ে থাকা বিমূঢ় বিজয়ের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল উত্তরদিকে তাদের প্রকোষ্ঠের দিকে।

তখনও ভাগীরথীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে একভাবে। সামান্য জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সংঘভূমির ওপর। সেই মরা জ্যোৎস্নার দিকে চোখ রেখে হঠাৎ বিজয়ের মনে হল তার সামনে খুব বড় কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

[চলবে]

ঘর কন্না

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

ঘর বানাতে, ঘর ভাঙতে
এখন খুকু ব্যস্ত,
তার পরেতো রান্না হবে
ধুলোর আলুপোস্ত।

তোমরা যাকে ঘাস বলছ
সেতো খুকুর শাক,
চোখের মাথা ঠিক খেয়েছো
শুনছো খুকুর হাঁক ?

সাহেব, বিবি, গোলাম দিয়ে
ঘরখান তার বেশ !
ঘুমটা এলে তবে খুকুর
ঘরকন্না শেষ।

মাকে

সুধীন্দ্র সরকার

কার সাথে মা বসবে খেলায়
ঘুঘু ডাকা দুপুর বেলায়,
কাল থেকে যে আমি মাগো
ইস্কুলেতে যাবো।

একলা তুমি জানলা দিয়ে
বোনটিকে মা সঙ্গে নিয়ে,
ভাববে জানি দুষ্টু খোকার
সঙ্গ কখন পাবো।

মা তুমি কি সত্যি বোকা
বলতে পারো কাদের খোকা,
আদর খেতে সকাল দুপুর
থাকে মায়ের পাশে।

বড় হওয়া যায় কি তাতে
পাশ করা যায় পরীক্ষাতে ?
লেখাপড়া শিখলেই না—
সবাই ভালবাসে।

একটি তীর ঃ একটি গান ★ অম্লান ভট্টাচার্য

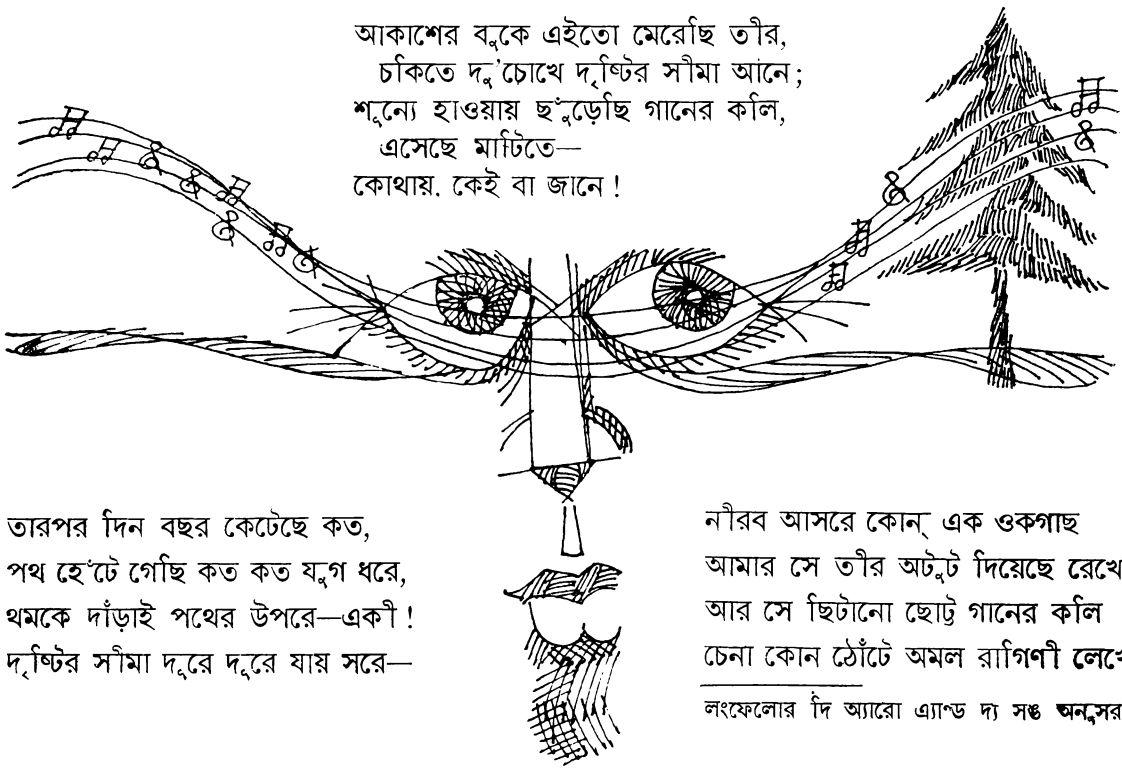

আকাশের বুকে এইতো মেরেছি তীর,
চকিতে দু'চোখে দৃষ্টির সীমা আনে;
শূন্যে হাওয়ায় ছুঁড়েছি গানের কলি,
এসেছে মাটিতে—
কোথায়, কেই বা জানে!

তারপর দিন বছর কেটেছে কত,
পথ হেঁটে গেছি কত কত যুগ ধরে,
থমকে দাঁড়াই পথের উপরে—একী!
দৃষ্টির সীমা দূরে দূরে যায় সরে—

নীরব আসরে কোন্ এক ওকগাছ
আমার সে তীর অটুট দিয়েছে রেখে,
আর সে ছিটানো ছোট্ট গানের কলি
চেনা কোন ঠোঁটে অমল রাগিণী লেখে॥

লংফেলোর দি অ্যারো এ্যান্ড দ্য সঙ্ অনুসরণে

আমি

তাপসকুমার মণ্ডল

হঠাৎ আলোর একটু আশা
নীল আকাশে মেঘের বাসা,
ঘাসের মাথায় আদর দেওয়া
একটুখানি নবীন হাওয়া—
আমি।

সবুজ বনে সন্ধ্যা ধীরে
দুষ্টু পাখির ছোট্ট নীড়ে,
শাল-শিমুলের ক্লান্ত মাথায়
সন্ধ্যাতারার নম্র ভাষায়—
আমি।

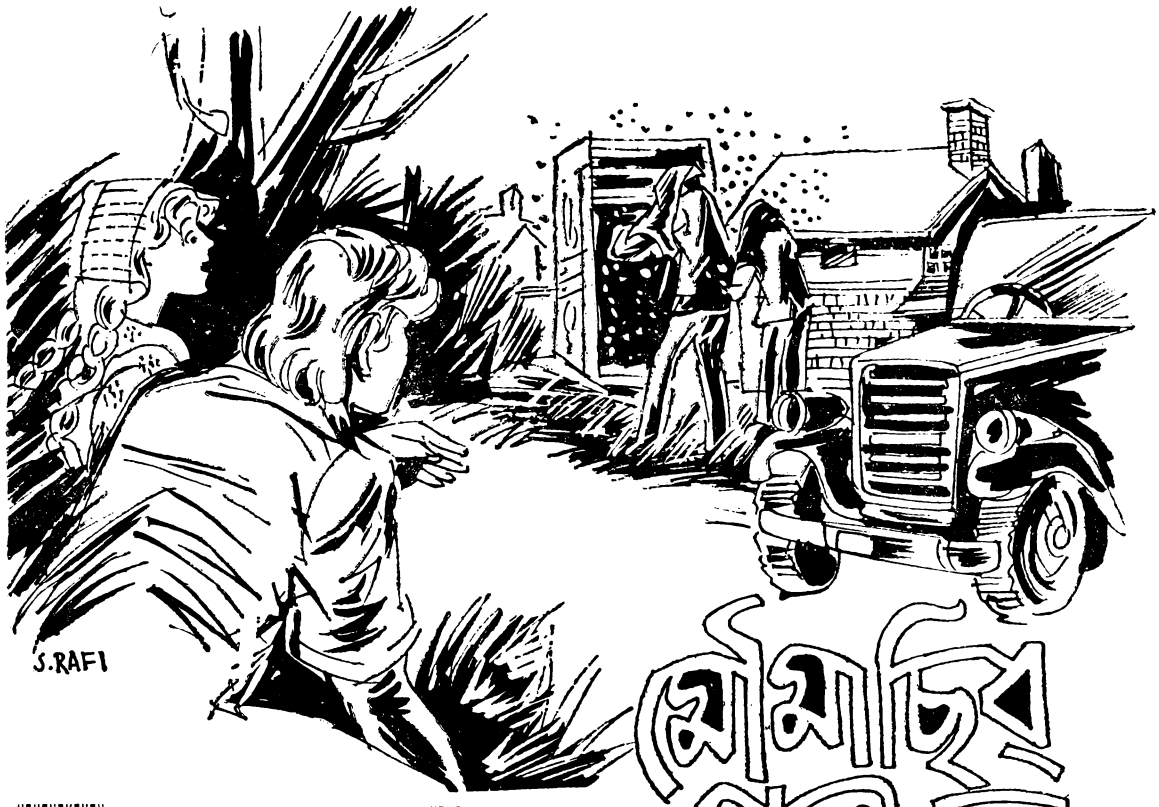

গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক, তাই না!—বিস্ময়ের সুরে রাথ বললো: হারবার্ট কাকা হঠাৎ মৌমাছি সংগ্রহের ব্যাপারে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর তাঁর কাজের খবর মিঃ টিমকিন্‌স্‌ ছাড়া অপরের কাছে কেনই-বা গোপন রাখা হচ্ছে।

নতুন বসানো মৌমাছির ঘরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে রোনাল্ড মাথা নাড়লো,—মোটেই রহস্যজনক নয়। হারবার্ট কাকা একজন বিজ্ঞানী, আর কে না জানে বিজ্ঞানী মাত্রেরই অল্পবিস্তর মাথার গোলমাল থাকে। আর টিমকিন্‌স্‌ তো একজন ডিটেকটিভ, সব ব্যাপারেই ওদের কৌতূহল বেশি।

অথচ এই তো ক'টা দিন আগের কথা। সপ্তাহখানেক আগে ওদের যখন গরমের ছুটি পড়ল ওরা দুভাইবোন মার সঙ্গে মৌচাকগুলো নিয়ে দিব্যি আরামে সময় কাটাচ্ছিল। এমন সময়ই ডঃ হারবার্ট ওদের মাকে চিঠি লিখলেন।

সবুজ ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওরা সেইসবই ভাবছিল।

ডঃ হারবার্ট বেশ জোর দিয়েই লিখেছিলেন যে রাথ এবং রোনাল্ড ছুটির বাকী দিনগুলো যেন তাঁর ওখানে কাটায়। কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তবে ওদের জানা—মৌমাছি পালন। চাররকমের মৌমাছি এবং চারটি নতুন কাঠের বাড়ী মৌমাছিদের পছন্দমত তৈরিও করে রেখেছেন তিনি। প্রথম ধাপে ছোট আকারের হলেও কাজটার গুরুত্ব নাকি অনেক। এ ব্যাপারে দক্ষ রাথ এবং রোনাল্ডের অভিজ্ঞতা তাঁর সেজন্যই বিশেষ প্রয়োজন, অবশ্য এর জন্য ওরা বেশ ভাল পুরস্কার পাবে। সবশেষে তিনি লিখেছিলেন,—এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'জাতীয় স্বার্থ'।

জাতীয় স্বার্থ!—অবাক হয়ে রোনাল্ড তখন মাকে জিগ্যেস করেছিলো: হারবার্ট কাকা নিশ্চয় তাঁর গবেষণার কাজে মধু ব্যবহার করবেন না!

ডঃ হারবার্ট সেইসময় একটি ফার্মে অত্যন্ত উঁচু-মানের গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। সরকারী গুরুত্বপূর্ণ গোপন গবেষণাগুলি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ঐ ফার্মটিকে।

ওদের মা উত্তর দিয়েছিলেন,—আমার মনে হয়, ওই-সব কাজেই ওঁর মধু প্রয়োজন। ওর চিঠিতেই আছে, উনি অনেক দেরী করে ফেলেছেন, আর মাত্র দিন-পনেরোর মধ্যেই মৌমাছিদের মধু সংরক্ষণের কাজ শুরু হবে। তোমরা আর দেরী না করে এখনি যাবার তোড়-জোড় করো।

রাথ এবং রোনাল্ডকে এরপরেই দেখা গেল ডঃ হারবার্টের খামারবাড়ীতে। ওদের সময় কাটতে লাগলো মৌমাছিদের তদারকীতে। এরই মধ্যে একদিন ডঃ হারবার্টের প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ টিমকিন্‌সের সংগে ওদের পরিচয়ও হলো।

ওরা শুনলো, বছরখানেক আগে ডঃ হারবার্টের পরীক্ষাগার থেকে অতি মূল্যবান একটি ফরমুলা চুরি হবার পরেই নাকি টিমকিন্‌স্‌কে নিয়োগ করা হয়েছিল।

শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ ভেঙে রাথই প্রথম কথা বললো,—আমার বিশ্বাসই হয় না যে মিঃ টিমকিন্‌স্‌ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

বেশ বিরক্তির সংগে রোনাল্ড বললো,—নাহয় থ্রিলার-গুলোর মধ্যে যে সব ডিটেকটিভদের দেখা যায় তাদের চেহারা বা পোশাকের সংগে টিমকিন্‌সের মিল নেই! তাই বলে—

বাজে বকো না।—এক ধমকে ওকে থামিয়ে দিয়ে রাথ বললো ঃ টিমকিন্‌স্‌কে কিরকম দেখতে সেবিষয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের চালচলন যেমন হওয়া উচিত তাকে আমি সেইভাবে দেখতে চাই।

—তুমি যদি ওকে কোন ভোঁতা অস্ত্রের গায়ে চুল জড়িয়ে বলতে বলো সেটা কার মাথার কিংবা ডাষ্টবিনে চারদিন আগের খাবারের টুকরো দেখিয়ে যদি প্রশ্ন করো সেদিন সকালের মেনু কি ছিল, সেগুলো টিমকিন্‌সের বিষয় নিশ্চয়ই নয়। তবে কোন জন্তুর টাটকা মৃতদেহ দেখলে ও নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

—মোটেই না। আমি ওকে সদ্য মরা একটা মুরগী দেখিয়েছিলাম, ও বলতে পারেনি কখন এক্‌ কিভাবে মুরগীটা মারা গিয়েছিল। মুরগীরা বুড়ো হলে নাকি যখন তখন মারা যেতে পারে, এটাই ছিল তার উত্তর।

—তুমি বলতে চাও মুরগীটা যে আত্মহত্যা করতে পারে একথাটা ওর মাথায় আসেনি।

—ঠাট্টার ব্যাপার এটা নয়।

শোন রাথ।—বোনকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে রোনাল্ড ঃ টিমকিন্‌স্‌কে রাখা হয়েছে হারবার্ট কাকার নিরাপত্তার কথা ভেবে। তাঁর গোপন গবেষণার পাহারাদারও সে।

আচ্ছা, সে নাহয় হল,—রাথ এবার সজোরে অন্য প্রশ্নে গেল ঃ মৌমাছি সম্পর্কে ওর এত আগ্রহ কেন? হারবার্ট কাকা নিজে কখনও মৌচাকগুলোর তদারকীতে যান না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। গবেষণার জন্য প্রয়োজন হলে মধুতো কিনলেই হয়।

ব্যাপারটা তা নয়!—রোনাল্ড এবার মুখ খুললো ঃ জ্বালানি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মধুকে তিনি ব্যবহার করতে চান না।

জ্বালানি! এটা কি তাঁর নতুন গবেষণার বিষয়?—রাথ তড়াক করে উঠে বসলো।

রোনাল্ড বললো,—বিমানচালনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের জ্বালানি প্রস্তুত হলো তাঁর গবেষণার বিষয়। কৃতকার্য হলে বিমানচালনার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসবে। অনেক কম জ্বালানিতে বিমানগুলো দ্রুতগতিতে উড়তে পারবে।

কিন্তু তুমি জানলে কি করে?—রাথ জিগ্যেস করলো।

—মিঃ টিমকিন্‌স্‌ বলেছে।

যা ভেবেছিলাম এখন দেখছি তাই।—রাথ গম্ভীর-ভাবে মাথা ঝাঁকাল।

কি ভেবেছিলে?—অবাক প্রশ্ন রোনাল্ডের।

একটা ঘাসের শিষ দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে রাথ বললো,—টিমকিন্‌স্‌ আদৌও কোন ডিটেকটিভ নয়, ভান করে হারবার্ট কাকার গবেষণা জেনে নিতে চায়। এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটে।

হুঁ—! ওসব কেবল বইতেই পাওয়া যায়!—ঠাট্টার সুরে রোনাল্ড বললো।

যাই হোক্‌, আমাদের উচিত টিমকিন্‌সের গতিবিধির দিকে নজর রাখা। রাথ নিজের বিশ্বাসে অটল। টিমকিন্‌স্‌কে আসতে দেখে ওরা চুপ করলো।

হঠাৎ দূরে টিমকিন্‌স্‌কে আসতে দেখে ওরা চুপ করে গেলো। সবুজ ঘাসগুলোর উপর পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিল টিমকিন্‌স্‌। শিশুর মত সরল হাসি মুখে লেগেই আছে।

কাছে এসে টিমকিন্‌স্‌ বললো,—তোমাদের বই-গুলো পড়ে আমার মাথায় একটা নতুন মতলব এসেছে। এর মধ্যে একদিন মৌমাছি পালন সংস্থার সম্পাদকের কাছেও গিয়েছিলাম।

আচ্ছা!—রাথ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঘাসের উপর বসে খুব আগ্রহ সহকারে টিমকিন্‌স্‌ শুরু করলো,—মাইল চারেক দূরে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে উলুখড়ের গাছ। দ্বিগুণ মধুর লোভে অনেকেই মৌচাকগুলোকে সেখানে নিয়ে গেছে। তোমরা কি বল এইসুযোগে আমাদের বাক্সগুলো সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়?

নিশ্চয়ই!—রোনাল্ড সংগে সংগে সমর্থন জানায় ঃ এই মৌমাছিগুলোর অতিরিক্ত মধু নেই অথচ মৌচাকগুলোর অনেক ঘর এখনও খালি। মোম তৈরি করতে হবে না অথচ ডবল মধু পাওয়া যাবে। রাথ তুমি কি বল?

টিমকিন্‌সের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে

গম্ভীরকণ্ঠে রাথ বললো,—পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। তবে ফাউল ব্রুডের সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। অন্যদের মৌচাক-গুলোর মধ্যে যদি কোন অসুস্থ মৌমাছি থেকে যায় তখন ?

ফাউল ব্রুড !—টাই-কলারটা ঠিক করতে করতে টিমকিন্‌স্‌ অবাক গলায় বললো : কথাটা শুনেছি দু-একবার। ব্যাপারটা কি ?

রোনাল্ড সংক্ষেপে বললো,—এটি মৌমাছিদের একটি রোগ, মধুপালকরা যাকে খুব ভয় পায়। রোগটা মধুতে সংক্রামিত হয় এবং মৌদস্যুরা অন্যত্র ছড়িয়ে ফেলে।

দস্যুতা ?—টিমকিন্‌স্‌ অবাক হলো : কিন্তু খুব অল্প লোকই মৌচাক লুঠ করতে সাহসী হবে। আমার তো মনে হয় মৌচাক এমন এক গোপন জায়গা যেখানে মূল্যবান কোন কিছু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে রাখা যায়। অবশ্য যদি খুব ভারী না হয়।

রাথ রোনাল্ডের দিকে চকিতে একবার তাকালো, রোনাল্ডের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ।

টিমকিন্‌স্‌ আবার বললো,—নিশ্চিতভাবে বলা যায় একজন দক্ষ মধুপালক ছাড়া মৌচাক লুঠ করতে কেউই সাহসী হবে না।

আমি মানুষ দস্যুদের কথা বলিনি !—রাথ হাসলো : তুমি বোধহয় জান না যে শক্তিশালী মাছিরা দুর্বল মাছিদের লুঠ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ওরা বেশ কিছু মারা যায়। লুণ্ঠিত দুর্বল মাছিদের মধ্যে যদি 'ফাউল ব্রুড' রোগ থাকে তবে শক্তিশালী মৌমাছিরা সেই রোগ বহন করে নিয়ে যায়।

কি অদ্ভুত !—সোৎসাহে মন্তব্য করে টিমকিন্‌স্‌ : আমার ইচ্ছে করে তোমাদের কাছ থেকে মৌমাছি সম্পর্কে আরও নতুন কিছু জানতে।

রাথ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টিমকিন্‌স্‌কে জরিপ করতে করতে প্রশ্ন করলো,—মিঃ টিমকিন্‌স্‌, মৌমাছি নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথা কেন বলতো ?

ওহ ! আমার পেশায় সবরকমের জ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন।—বলে টিমকিন্‌স্‌ ছেলেমানুষের মত হাসতে লাগলো।

এদিকে তিনদিন পরে মৌমাছিগুলোকে নতুন বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

সব মৌমাছিগুলোকে চারটি বাক্সবন্দী করে রাথ এবং রোনাল্ড, টিমকিন্‌স্‌কে সঙ্গে নিয়ে লরীতে চেপে বসলো।

উলুখড়ের চারাগাছগুলোর ছায়ার নীচে নতুন বাক্স-গুলো রাখা হলো। অপরের বাক্সগুলো থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

আমাদের বাক্সগুলোকে কেউ নিজেদের বলে যেন ভুল না করে।—বলে টিমকিন্‌স্‌ পকেট থেকে এক বাক্স টিনের চাকতি আর চারটি টিকিট বের করলো।

সেটা ঘটবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।—রোনাল্ড বললো : কারণ আমাদের বাক্সগুলো আনকোরা নতুন এবং সীডার কাঠের তৈরি। অন্যগুলো যথেষ্ট পুরনো এবং রঙচটা।

হাতুড়ি দিয়ে টিনের চাকতিগুলো ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ টিমকিন্‌সের কি যেন খেয়াল হলো। সে বললো,—টিকিটগুলো বেশ শক্ত দেখছি। এর উপরে ডঃ হারবার্টের নাম লেখা থাকলে আরও বেশি সাবধান হওয়া যায়। মৌমাছিরা টিকিটগুলো নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে না !

ওরা শুধু ভেতরের কাগজই খায়। বাইরের কাগজ ছোঁয়ও না—রাথ বললো।

শুধু কাগজ কেন, পাতলা নরম কাপড়ের টুকরোকেও ওরা বাদ দেয় না। চিবিয়ে চিবিয়ে টুকরোগুলোকে ওরা মৌচাকের বাইরে পাঠিয়ে দেয়।—রোনাল্ড বলল।

খুব খারাপ।—চাকতিগুলোকে জড়ো করতে করতে বিরক্ত স্বরে টিমকিন্‌স্‌ বললো : যখন তাদের মধু তৈরির কথা, সে সময়টা তারা নষ্ট করছে কাগজ বা কাপড় কেটে।

মৌমাছিদের বিরুদ্ধে কিছু বললে রাথের সহ্য হয় না, মৌমাছিরা ওর এতই প্রিয়। রোনাল্ড চোখের ইশারায় রাথকে নিষেধ করলেও সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে রোনাল্ডের ইঙ্গিত বুঝলো না। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে,—মৌমাছিরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। ওরা জানে নোংরা থেকে রোগ ছড়ায়। ওদের মরাদেহগুলোকে পর্যন্ত টেনে মৌচাকের বাইরে ফেলে দেয়। শীতকালে মাঝে মাঝে দু-একটি মরা ইঁদুরকে বাক্সের মধ্যে দেখা যায়। শীত থেকে বাঁচতে ইঁদুরগুলো ঢুকে পড়ে। ইঁদুরদের পচা দেহগুলো যাতে মৌচাককে দূষিত না করে সেদিকে ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। ছোটমাছি-গুলো ইঁদুরগুলোকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে পারে না বলে প্রোপলিশ দিয়ে ঢেকে ফেলে।

খুব শান্ত গলায় টিমকিন্‌স্‌ জিগ্যেস করলো,—প্রোপলিশটা কি ?

রোনাল্ডকে চুপচাপ দেখে রাথই বলে,—প্রোপলিশ হলো মৌমাছির আঠা। এক ধরনের চটচটে পদার্থ যা মৌমাছিরা তাদের পরাগ ঝুড়িতে সংগ্রহ করে। ওরা এটা সংগ্রহ করে একরকমের বাদামগাছ থেকে। ছিদ্র বা ফাটল সারাতে মৌমাছিরা প্রোপলিশকে ব্যবহার করে।

রাথ যখন টিমকিন্‌স্‌কে প্রোপলিশ বোঝাতে ব্যস্ত ছিল, টিমকিন্‌সের মন কিন্তু তখন অন্যখানে। সেটা ধরা পড়লো ওর প্রশ্নে,—ওরা নিশ্চয়ই কোন স্বচ্ছ ধাতু চিবোতে পারবে না ?

আচমকা এই প্রশ্নে রাথ এবং রোনাল্ড দুজনেই দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেল। অবাক গলায় রাথ জিজ্ঞেস করলো,—কিন্তু বাক্সের ভিতরে স্বচ্ছ ধাতু কেউ রাখতে যাবে কেন ?

কোন উত্তর না দিয়ে টিমকিন্‌স্‌ থেমে গেল। দেখা

গেল, কয়েকটা চিন্তার রেখা ওর কপালে জ্বলজ্বল করছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর লরিটা ওদের নিয়ে ডঃ হারবার্টের গেটের কাছে থামলো।

টিমকিন্‌স্‌ই প্রথম কথা বললো,—তোমাদের আর যেতে হবেনা, আমি একলাই ওদের দেখাশুনার কাজ চালাতে পারবো। বারবার কাছে গেলে আশাকরি মৌমাছিরা বিরক্ত হবে না।

তদারকির তেমন কিছু নেই!—রাথ বললো: যতক্ষণ মধু সংগ্রহ শুরু না হয়, ততক্ষণ কিছু করবার নেই।

রোনাল্ড সায় দিয়ে বললো,—মৌমাছিদের যত কম বিরক্ত করা যায় ততই মঙ্গল। বিরক্ত হলে ওরা কাজ বন্ধ রাখে।

নিজের মনে টিমকিন্‌স্‌ প্রায় ফিসফিসিয়ে উঠলো,—আশ্চর্য জীব! ওরা কাগজ খায় ভাবাই যায় না।

সেদিন রাত্রে ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে আর এক প্রস্থ আলোচনা শুরু করলো। টিমকিন্‌সের আচরণ যে রীতিমত সন্দেহজনক, এ বিষয়ে তারা এখন সম্পূর্ণ এক মত।

রাথ বললো,—আমার অনুমান, আর অনুমানই বা বলি কেন, আমি নিশ্চিত যে টিমকিন্‌স্‌ সেই বাক্সের ভিতর মূল্যবান কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু তাতে সুবিধেটা কি? বাড়ীতে তো ওর নিজস্ব সিন্দুক রয়েইছে।—রোনাল্ডের গলায় অবিশ্বাসের দোলা।

এদিকে টিমকিন্‌সের উপর নজর রাখা ওদের পক্ষে বেশ কঠিন। খুব অল্প সময়ের জন্য সে ঘরে থাকে, বেশীরভাগ সময়টাই বাইরে। রাথ এবং রোনাল্ড পিছন থেকে সাইকেলে ওকে খুব বেশি দূর অনুসরণ করতে পারে না, কিছুদূর গিয়েই টিমকিন্‌স্‌ হয়ত ওর জানা-শুনা কোন বাড়ীতে ঢুকে যায়।

শেষে এমন হলো ও যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ সেটাও সে ভুলে গেল।

ঠিক এই সময়ই একদিন জানা গেল, ডঃ হারবার্ট তাঁর গবেষণা শেষ করেছেন।

একদিন বিকালে চায়ের আসরে ডঃ হারবার্ট নিজেই ঘোষণা করলেন,—আমার গবেষণা শেষ হয়েছে টিমকিন্‌স্‌।। যেমনটি ভেবেছিলাম তেমনটি পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস। আমার সাফল্য সম্বন্ধে যদিও আমি নিশ্চিত তবু আরও কয়েকবার গবেষণালব্ধ ফলটা পরীক্ষা করতে চাই।

ভাল, খুব ভাল।—বইয়ের দিকে মুখ রেখে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে টিমকিন্‌স্‌ বললো: আমি জানতাম না মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়বার আগে বিদায়ী রানীকে উপোষী রাখে।

উলুখড় চারাগাছগুলোর ছায়ায় নতুন বাক্সগুলোর ভিতরে মৌমাছিরা ইতিমধ্যে গুঞ্জন শুরু করে নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাথ এবং রোনাল্ড বেশ কয়েক-বার নতুন মৌচাকগুলোকে দেখে এসেছে। টিমকিন্‌স্‌কে সেখানে একবারও দেখা যায় নি। ওরা নিঃসন্দেহ টিমকিন্‌স্‌ ওদের উপদেশ শুনেছে, অনর্থক গিয়ে মৌমাছিদের জ্বালাতন করে নি।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। একরাতে শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। সকাল হতেই রাথ এবং রোনাল্ড সাইকেল নিয়ে নতুন মৌচাকগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ছুটলো।

সহসা কাল ঘোমটা মাথায় বাক্সগুলোর সামনে টিমকিন্‌স্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু তফাতে ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। ওর পাশে মাটির উপর পড়েছিল কাপড়ে জড়ানো একটা তাক যার অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ তখনও খালি অর্থাৎ মধু জমেনি। বাঁহাতে ছুঁচলো মুখওয়ালা যন্ত্রটা মৌবাক্সের প্রবেশ পথের দিকে বাগিয়ে ধরে সে তা থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ছিল। কতকগুলো মৌমাছি রাগে ওর মাথার চার-পাশে উড়ছিল। ডানহাতটা হঠাৎ পকেটে ঢুকিয়ে কি একটা বের করে আনলো। সূর্যের আলোয় সেটা চকচক করছে। একমুহূর্তের মধ্যে সেটাকে টিমকিন্‌স্‌ চালান করে দিল মৌচাকের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি!—রাথ উত্তেজনায় ফিসফিস করে উঠলো: এদিকে চলে এস রোনাল্ড, লুকিয়ে পড়ি। ও এই পথেই ফিরবে।

টিমকিন্‌স্‌ ইতিমধ্যে তাকটাকে ভিতরে পুরে মৌবাক্সের ঢাকনা এঁটে উঠে দাঁড়িয়েছে।

রোনাল্ডের দেরি হয়ে গিয়েছিল, ওকে দেখে ফেলল টিমকিন্‌স্‌। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে এগিয়ে এসে বললো,—আমি দেখছিলাম মৌমাছিরা ওদের ঘরগুলো ঠিকমত মধু দিয়ে ভরেছে কিনা। ওদের কাজ দেখে বাস্তবিক আমি অবাক হয়ে গেছি। আমি অপেক্ষা করছি, একসঙ্গে ফেরা যাবে।

আমাদের দেরী হবে।—গম্ভীর গলায় রাথ বললো: তুমি বরং এগোও।

আমার কোন তাড়া নেই। তোমরা কিন্তু বেশী দেরী করলে ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে পারে।—বলে টিমকিন্‌স্‌ আকাশের দিকে তাকালো।

আকাশে তখন সত্যসত্যই কয়েকটুকরো মেঘ জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হল। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও ওদের স্থান ত্যাগ করতে হলো।

রোনাল্ড রাথের কানে কানে বললো,—আজ বিকেলেই আবার আসবো, বুঝলে।

কিন্তু, সেদিন বিকেলেই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। রাথ বা রোনাল্ড কেউই বেরোতে পারলো না।

পরদিন সকাল। আকাশ বেশ পরিষ্কার। মিঠে রোদে চতুর্দিক ঝলমল করছে।

টিমকিন্‌স্‌কে ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা নিজের ঘরের দিকে যেতে দেখে রাথ এবং রোনাল্ড তাড়াতাড়ি সাইকেল

নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। শীঘ্রই ওরা হাজির হলো উলুখড় গাছগুলোর কাছে।

রাথ বললো,—টিমকিন্‌স্‌ এসে পড়বার আগেই আমাদের অনুসন্ধান কাজ শেষ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হারবার্ট কাকার মূল্যবান আবিষ্কারের দলিল টিমকিন্‌স্‌ মৌচাকের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ রোনাল্ড ব্যস্ত হয়ে এ পকেট ও পকেট খুঁজতে লাগলো। তারপর হতাশ গলায় বললো,—আসবার সময় ঘোমটাটা পকেটে ভরে নিয়েছিলাম, সম্ভবতঃ রুমাল টানতে গিয়ে সেটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছে।

অপদার্থ!—রাথ উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো: এখন কি করবে? ফিরে যাবে?

—ঘোমটা ছাড়াই কাজ চালাব।

—তা তো বটেই! কামড়ে মৌমাছিরা তোমার মুখ-চোখ ফুলিয়ে দেবে। গতরাতের ঝড়-জলের পর তুমি জান ওরা কি রকম রেগে আছে!

ঠিক আছে। আমি ফিরে যাচ্ছি। মনে হয় রাস্তায় কোথাও ঘোমটাটা পড়ে আছে।—রোনাল্ড সাইকেলটায় উঠতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলো।

একটা গাড়ীর শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিলো। একটু পরেই উঁচু নীচু পথ ভেঙে একটা ছোট গাড়ী ওদের কাছাকাছি একটা ঝোপের কাছে এসে থামলো। দুজন লোক লাফিয়ে নামলো—একজন লম্বা আর একজন বেঁটে। ওদের হাতে ছিল মাছি তাড়ানো ধোঁয়াযন্ত্র, মাথায় শোলার টুপির সঙ্গে সমস্ত মুখকে ঢেকে ফেলবার উপযুক্ত ঘোমটা।

লম্বা লোকটি রোনাল্ডের দিকে এগিয়ে এসে বললো,—তোমাদের কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত। আমরা সরকারী ইনসপেক্টর। মৌবাক্সগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই কোথাও কোনো ফাউল ব্রুডের সম্ভাবনা আছে কিনা। এগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের?

লোকটি পকেট থেকে তার পরিচয়পত্র বের করে ওদের ভাই-বোনকে দেখালো। মৌমাছি সংরক্ষণ-সমিতির ছাপানো ফর্ম।

আমার বোন রাথ আপনাদের সাহায্য করতে পারবে। আমি এখনি ফিরে আসছি।—রোনাল্ড এবার দ্রুতবেগে সাইকেলে উঠে পড়লো।

লোকদুটি একটির পর একটি মৌবাক্স খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো। রাথ চুপচাপ ওদের কাজ লক্ষ্য করছিলো।

দ্বিতীয় বাক্সটি খুলে সব প্রকোষ্ঠের মধুর দিকে তাকিয়ে উপরের তাকটা খুলে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি একটা থাম নজরে পড়লো। রাথের থামটি তাকটির সঙ্গে একদম এঁটে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে দেশলাইকাঠি জেবলে ওরা কুঠুরীগুলো দেখছিল। ফাউল ব্রুডের ইঙ্গিত যা থেকে মিলত সেই বাদামী রঙের পদার্থ কোথাও দেখা গেল না।

অকস্মাৎ বেঁটে লোকটি মুখে হাত দিয়ে বসে পড়লো। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আমার ঘোমটার মধ্যে একটা মৌমাছি ঢুকেছে, আমায় একটু সাহায্য করবে মিস্‌।

ঘোমটার ভাঁজগুলো বাইরে থেকে ভাল করে দেখে নিয়ে রাথ বললো,—আমি কোন মৌমাছি দেখতে পাচ্ছি না, তুমি ঘোমটাটা খুলে ভাল করে ঝেড়ে ফেল।

ঘোমটা খুলে চোখে হাত দিয়ে লোকটা কিন্তু ওঃ আঃ নানারকম শব্দ করে যেতে থাকে। কাতরাতে কাতরাতে বলে সে,—আজকের মত আমার কাজের দফা রফা। মৌমাছিটা ডান চোখের পাতায় কামড়েছে, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই চোখটা নির্ঘাৎ ফুলে উঠবে।

চোখে হাত দিয়ে ওকে গাড়ীর দিকে যেতে দেখে অন্য সঙ্গীটি বলে উঠল,—কি করবে বলো! মন্দ বরাত! চলো ফিরেই যাই আজকের মত।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে রাথের সামনে দিয়ে গাড়ীটা ঢালু রাস্তা বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল।

গাড়ীটা চোখের আড়াল হতেই রাথ তন্নতন্ন করে দ্বিতীয় বাক্সটির উপরের তাকটি খুঁজলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! থামতো দূরের কথা কোন কাগজ পাওয়া গেল না। ওকে লোকদুটো ফাঁকি দিয়ে থামটা নিয়ে গেছে মনে হতেই দেরি না করে ও সাইকেলটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো।

পথেই দেখা হল রোনাল্ডের সঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে রাথ সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললো। সব শুনে রোনাল্ড বললো,—পুরো ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। ওরা আদৌ কোন ইনসপেক্টরই নয়।

—এ্যাঁ! কিন্তু ওরা যে সরকারী কাগজ দেখাল।

—শোন; হাতে সময় বেশি নেই। এখনই স্টেশনে যেতে হবে, যাবার পথে তোমাকে সব বলছি। দেরি হলে পাখি উড়ে যাবে।

রোনাল্ড লাফিয়ে উঠে পড়লো সাইকেলে। পেছন থেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাথ জিগ্যেস করলো,—ষ্টেশনে কেন?

—টিমকিন্‌স্‌কে আটকাতে হবে। ও যাতে ট্রেনে করে না পালাতে পারে।

সাইকেলে যেতে যেতে রোনাল্ড সংক্ষেপে রাথকে বললো,—আমি যখন ব্যস্ত হয়ে রাস্তায় ঘোমটাটা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় মৌসংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সব শুনে তিনি বললেন, এই জেলাতে কোনো ইনসপেক্টর নেই। আমি তাঁকে সমিতির ছাপানো ফর্মের কথা বলতে তিনি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

রোনাল্ডকে থামতে দেখে রাথ হামলে উঠল,—তারপর?

তিনি বললেন,—রোনাল্ড বলে চলে: কয়েকদিন আগে কয়েকটা ফর্মের খোঁজ না পেয়ে ভেবেছিলেন

হয়ত ভুল করে কোথাও রেখে দিয়েছেন, পরে নিশ্চয়ই পাবেন। আমার কাছ থেকে শুনে সম্পাদক গম্ভীর হয়ে তাড়াতাড়ি ওঁর গাড়ি আনতে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

আমি সময়মত ঠিক এসে পড়তাম। একটা ভাঙা গাছের ডাল সামনের চাকায় আটকে যাওয়ায় আমাকে রাস্তায় নেমে পড়তে হলো। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ডালটাকে টেনে বের করতে। সাইকেলে উঠতে যাবো, দেখি টিমকিন্‌স্‌ চলে যাচ্ছে। ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসানো রয়েছে ছোট একটা সুটকেশ। ও আমায় দেখতে পায় নি কিন্তু আমি দেখেছি ওকে ষ্টেশনের দিকে বাঁক নিতে।

রোনাল্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে রাথ বললো,—আমি বুঝতে পারছিনা কিভাবে টিমকিন্‌স্‌কে আটকাবে। অন্য কারুর সাহায্য চাইবে সেরকম সময়ও তো হাতে নেই।

ওরা যখন ষ্টেশনে পেঁছিল তখন ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে, ট্রেন এল বলে। টিমকিন্‌স্‌কে দেখা গেল একটা বেঞ্চে বসে থাকতে। সুটকেশটা পাশে রেখে চুপচাপ বসেছিল সে।

রোনাল্ড লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বললো,—আমরা তোমাকে পালাতে দেব না।

—ওহ্‌, তোমরা তাহলে আমাকে খুঁজে পেয়েছ!

অনেক কিছুই আমরা পেয়েছি।—রোনাল্ড গম্ভীর-কণ্ঠে বললো: মৌসংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকের কাছ থেকে জেনেছি এ তল্লাটে কোন ইনসপেক্টর নেই। আমাদের মৌবাক্সগুলোয় যারা তল্লাশী চালিয়েছিল তাদের আমরা এবার খুঁজছি।

ওরা আসবে আমি জানতাম।—নিচু গলায় টিমকিন্‌স্‌ বললো: হ্যাঁ, আমার অনুমান ঠিকই দেখছি।

—হ্যাঁ, এবং তুমি মৌবাক্সে যে খামটি লুকিয়ে রেখেছিলে ওরা সেটি নিয়ে গেছে।

—আমি জানতাম.....ট্রেনের আওয়াজে ওর বাকী কথাগুলো শোনা গেল না।

—আচ্ছা চলি, আমার উচিত তোমাদের কাছ থেকে বিদায় চাওয়া।

তোমার এখন যাওয়া হবেনা।—টিমকিন্‌সের পথ আগলে দৃঢ়স্বরে রোনাল্ড বললো।

যেতে দেবে না!—অসহায়চোখে ট্রেনটার দিকে তাকাল টিমকিন্‌স্‌, তারপর হঠাৎ সুর পালটে সহজ গলায় বললো: বেশ চলো তবে বাড়ি ফেরা যাক। এতক্ষণে সেই স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি খামটি একটি বেসরকারী ফার্মের হাতে চলে গেছে যার মধ্যে থাকার কথা সেই গুরুত্বপূর্ণ ফরমুলাটা।

আর তুমি এখানে বসে আছো?—রাগে ক্ষোভে রাথ চিৎকার করে উঠলো।

টিমকিন্‌স্‌ নির্লিপ্ত গলায় বললো,—ওদের পাকড়ে কি লাভ হবে?

লাভ—মানে ফরমুলাটা?—রোনাল্ড রুখে উঠলো।

কিন্তু, বন্ধু—টিমকিন্‌স্‌ সরল হেসে বলে: ওটা আসল নয়—স্রেফ জাল!

এ্যাঁ! !—বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো দুজনে!

টিমকিন্‌স্‌ দুজনের ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল:

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ঐসব ফার্মগুলোকে বোকা বানানো যায়। আমি জানতাম ওরা ডঃ হারবার্ট এবং তাঁর গবেষণার উপর কড়া নজর রেখেছে, ওরা যে আমাদের পাড়াতেই থাকতো এখবরও আমার জানা ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম ওরাও মৌপালন করে। তুমি তো জান যারা মৌচাষ করে সাধারণতঃ তারা ভাল লোক হয় এবং নিজেদের মধ্যে তারা বন্ধুত্ব তৈরি করে ফেলে। এখন বুঝতে পারছো আমরা কেন মৌপালনে এত আগ্রহ দেখিয়েছিলাম?

তোমাদের গতিবিধি যাতে ওদের সহজেই নজরে পড়ে!—রাথ অতিকষ্টে বললো।

—ঠিক ধরেছ। স্থানীয় সমস্ত মৌচাষীদের আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম এবং তোমাদের মতামতও জানতে চেয়েছিলাম মৌবাক্সে মূল্যবান কিছু গোপন রাখা সম্ভব কিনা। এমনকি ঐসব ফার্মের লোকদের সঙ্গে পর্যন্ত এবিষয়ে কথা বলেছিলাম। ওদের সুবিধার জন্য মৌবাক্সগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন খামটা রেখে এলাম। বাকী অংশটুকু তোমরা জানো।

না, সবটা জানিনা।—রোনাল্ড বাধা দিল: আমরা জানিনা ঐ বদ্‌লোকগুলি মৌমাছি সংরক্ষণ সমিতির ছাপানো ফর্মগুলো কিভাবে পেল, যেগুলোর সাহায্যে ওরা নিজেদের ইনসপেক্টর সাজতে পারল।

হুঁ।—মাথা নাড়ল টিমকিন্‌স্‌: মৌপালন সমিতির অফিসে সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে মাঝেমধ্যে যেতাম। একদিন সমিতির কয়েকটা কাগজ লুকিয়ে পকেটে পুরে সোজা চলে গেলাম ঐ বদ্‌লোকগুলোর আড্ডায়। গল্প করতে করতে একফাঁকে পকেটে হাত চালিয়ে অন্য-মনস্কতার ভান করে কাগজগুলোকে বের করে আনলাম। তারপর চোখে পড়তেই ভয় পেয়েছি এমন ভাব দেখিয়ে উঠে পড়লাম।

ওরা আমাকে খুব বোকা ভাবলো। আমার পরি-কল্পনার ওটাই ছিল শেষ চাল। কাগজগুলো ছাড়া ওদের পক্ষে মৌবাক্সে তল্লাশী চালানো যে অসম্ভব ছিল সেটা সহজেই বুঝতে পারছো।

ডঃ হারবার্টের বাড়ীর গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে টিমকিন্‌স্‌ হঠাৎ শিশুর মত সরলতায় হাততালি দিয়ে একবার ঘুরপাক খেয়ে নেচে বলল,—ওরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ডঃ হারবার্টের ফরমুলা ওদের আর কাজে লাগছে না। কি বল তোমরা?

Todd রচিত Telling the bees গল্পের অনুসরণে ॥

আফ্রিকায় সাপের সন্ধানে

একদিনের অনগ্রসর অন্ধকার আফ্রিকা আজ দ্রুত অগ্রগতির পথে। কিন্তু তার গভীর শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য —দীর্ঘকায় সব মহীরুহ আজও মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে।

সাধারণ লোকে ভয় পেলেও যাঁরা নতুন নতুন জিনিস জানতে চান, নতুন নতুন গাছপালার খোঁজ পেতে চান, নতুন নতুন জন্তু-জানোয়ার দেখতে চান,—তাঁরা এসব অরণ্যে প্রবেশ করেন আর মৃত্যুর খাঁড়া মাথায় ঝুললেও ঘুরে ঘুরে সব দেখেন।

এরূপ একটি গভীর অরণ্যের পথ ধরে চলেছেন শ্রীরামনাথন আর তাঁর দুজন সংগী। সংগী দুজনের একজন হলেন অধ্যাপক বেরা, অপরজন মিঃ থম্বে।

রামনাথন একজন নামজাদা সর্প-ব্যবসায়ী। তাঁর অধীনে আছে বহু কর্মচারী; কিন্তু বিভিন্ন সর্প-সংগ্রহ অভিযানে তিনি নিজেই প্রধান ভূমিকা নেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচিত্র সব সাপ ধরে তিনি ছোট-বড় সব পশুশালায় চালান দেন, আর প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

ব্যবসা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও অরণ্যের গভীরে সর্পকুল কেমন আচরণ করে, তা দেখাও ছিল তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন অধ্যাপক বেরা। আর থম্বে হচ্ছেন আফ্রিকারই অধিবাসী। গহন বনের অন্দরে-কন্দরে কোথায় কি আছে—সব আটঘাট তাঁর নখদর্পণে।

পায়েহাঁটা সরু পথ। সে পথ ধরেই চলেছেন তিনজন। খুবই সতর্ক। কোথা থেকে কোন হিংস্র জন্তু ঘাড়ে লাফিয়ে না পড়ে। আর সরীসৃপের ছোবল? তিনজনেরই হাঁটু পর্যন্ত মোটা চামড়ার বুট। ছোবল মারলেও তা মারাত্মক হবে না।

কত বিচিত্র দৃশ্য! বিভোর তিনজন। আফ্রিকার জঙ্গলে ব্যাঘ্ররাজ নেই। তবে পশুরাজ সিংহ তার ভারিক্কি চালে বর্তমান।

বর্তমানই বটে! তিনজনই হতভম্ব...চলৎশক্তিহীন! সামনেই পশুরাজ সশরীরে! সামান্য কিছু দূরে। অপ্রত্যাশিত!

হাতিয়ারটা একটু ঠিকমত করে ধরবেন, সে তাকতও আসছে না তাঁদের। মুখ ব্যাদান করলেন পশুরাজ বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

কিন্তু হঠাৎ কি হল! যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পশুরাজ তার পায়ের থাবা দিয়ে ডান চোখটা চেপে ধরে পেছনে দে ছুট! স্তম্ভিত রামনাথন, ততোধিক হতচকিত অধ্যাপক বেরা!

কিন্তু তাঁদের বিস্ময়ের তখন আরও বাকি। বিপুলদেহী থম্বের এক জোর ধাক্কায় অধ্যাপক বেরার মুখ গেল ঘুরে!

অধ্যাপক বেরা বিরক্ত হবেন কি তিনি গভীর আতঙ্কে দেখলেন, তাঁর গা বেয়ে তরল কি যেন গড়িয়ে পড়ছে! মধু যেন। কিন্তু মৌচাক তো দেখছেন না। থম্বে যেন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারেন, বলেন—মধু নয় অধ্যাপক, সর্পবিষ!

সর্পবিষ!—আঁতকে ওঠেন অধ্যাপক বেরা। সাপের বিষ মধুর মত অনেকটা দেখতে বটে। তবে কোন বিষধর সাপ তো তাঁকে দংশন করেনি। বিষ আসবে কোথা থেকে

কিছুদূরে পলায়মান একটি সাপের দিকে আঙুল নির্দেশ করে থম্বে উত্তর দেন—এ হল বিষবর্ষী চক্রধর সাপ। এ সাপ দূর থেকেও বিষ নিক্ষেপ করে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে।

অবনীভূষণ ঘোষ

আমাদের দেশের গোখরো কেউটের মতই এ সাপও ফণাধর—অধ্যাপক বেরা লক্ষ্য করেন।

দূর থেকে বিষ নিক্ষেপ করতে পারে! তা কি করে সম্ভব?—জিজ্ঞাসা করেন রামনাথন।

পশুরাজ সিংহের কবল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা পেয়েছেন তিনজন। তিনজনের কেউই তখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন নি। থম্বে বলেন,—চলুন আগে আমাদের তাঁবুতে ফিরে যাওয়া যাক; সেখানেই সব কথা হবে।

তাঁবুতে তিনজনে একটু বিশ্রাম করে গরম কফির কাপ হাতে নিয়ে নিজ নিজ চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। থম্বে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

আমরা জানি বিষধর সাপের মুখে থাকে দুপাশে একটি করে দুটি লম্বা সূচাল সক্রিয় বিষদাঁত। প্রত্যেক বিষদাঁতের পিছনে থাকে ছোট পেঁয়াজের কোয়ার মত একটি করে বিষগ্রন্থি। একটি সরু নালি এই বিষগ্রন্থিকে যুক্ত করে বিষদাঁতের সঙ্গে। বিষধর সাপ কাউকে ছোবল মারলে তার বিষগ্রন্থিতে চাপ পড়ে। দুভাবে এ চাপ পড়ে। চাপ খানিকটা পড়ে বিষগ্রন্থির সংকোচনে আর খানিকটা চাপ পড়ে দংশনের সময় বিষদাঁতের গোড়ায়। চাপে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বেরিয়ে নালি দিয়ে বিষদাঁত বেয়ে দৃষ্ট প্রাণীর রক্তে যায় মিশে। এই হল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিষবর্ষী চক্রধরের বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বের হতে ছোবল মারার দরকার হয় না—শুধু বিষগ্রন্থির সংকোচনেই দূর থেকে সে মুখ থেকে বিষ ছুঁড়ে দিতে পারে। আমরা যেভাবে থুথু ফেলি, ঠিক সেভাবে কিন্তু বিষবর্ষী চক্রধর বিষ নিক্ষেপ করে না। বিষ মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে না। বিষদাঁত বেয়ে সোজাসুজি বিষ গিয়ে পড়ে আক্রান্ত প্রাণীর ওপর।

কিন্তু মাত্র বিষগ্রন্থের সংকোচনেই কি বিষ ঠিকমত দূরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে!—সংশয় প্রকাশ করেন অধ্যাপক বেরা।

থম্বে বলেন,—আপনি ঠিকই সংশয় প্রকাশ করেছেন, অধ্যাপক। তবে সঠিকভাবে যাতে বিষ নিক্ষেপ করতে পারে, বিষবর্ষী চক্রধরের বিষদাঁতও সেভাবে বিবর্তিত ও গঠিত হয়েছে। এর বিষদাঁতের আগা এমনভাবে থাকে যে বিষগ্রন্থির সংকোচনে নির্গত বিষ বিষদাঁতের কেন্দ্ররেখার প্রায় সমকোণে ছুটে যায়। যেসব সাপ বিষ বর্ষণ করে না অথবা কদাচিৎ করে, তাদের বিষদাঁতের ছিদ্র নিম্নমুখী; অপরপক্ষে বিষ নিক্ষেপে সুপটু সাপদের বিষদাঁতের ছিদ্র সোজাসুজি সম্মুখমুখী।

বিষবর্ষী চক্রধর মাথাটা তুলে পিছনে কিছুটা হেলিয়ে দেয়, মুখটা সামান্য ফাঁক করে আর বিষগ্রন্থি সংকুচিত করে সোজাসুজি অভিপ্রেত দিকে বিষ নিক্ষেপ করে। বিষদাঁত দুটি বয়ে দুটি সরু তীব্র ধারায় দূরে নিক্ষিপ্ত হয় বিষ। বিষ নিক্ষেপের সময় ঐ সাপ জোরে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে। সে যে রেগে গেছে অথবা ভয় পেয়েছে, ফোঁসফোঁসানি মনে হয় তারই লক্ষণ।

বাধা দিয়ে রামনাথন বলেন,—কিন্তু সর্পবিষ রক্তে না মেশা পর্যন্ত আমাদের তো কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে থম্বে সায় দেন,—ঠিক, ঠিক বলেছেন। বিষবর্ষী চক্রধর দূর থেকে বিষ নিক্ষেপ করতে পারলেও একটি বিষয়ে রক্ষে যে, সাপের বিষ আমাদের গায়ের ওপর পড়লে কোন ক্ষতি হয় না। সর্পবিষ তখনই সক্রিয় হয় যখন তা রক্তের সঙ্গে মেশে। কোন কোন পর্যটকের কাহিনীতে আমরা পড়ি, বিষবর্ষী চক্রধর দূর থেকে কোন ব্যক্তির পায়ে বিষ নিক্ষেপ করেছে, আর তার সে জায়গাটা ঝলসে গেছে! একথা কিন্তু ঠিক নয়। যাই হোক, বিষবর্ষী চক্রধরের বিষ আমাদের গায়ে লেগে কোন ক্ষতি না করলেও চোখে লেগে ক্ষতি করতে পারে। চোখের পর্দার ঠিক তলায় যে রক্তবাহী নালি আছে এই বিষ তার সংস্পর্শে এসে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিতে পারে.....চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য বিষ লাগার সঙ্গে সঙ্গে চোখ যদি ভাল করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলা যায়, তা হলে কোন ক্ষতি হয় না। বিষবর্ষী চক্রধর আড়াই মিটারের বেশি দূর পর্যন্ত বিষ নিক্ষেপ করতে পারে—এবং সেই নিক্ষিপ্ত বিষ একজন দণ্ডায়মান লোকের চোখে গিয়ে লাগতে পারে!

পরিবেশের চাপে জীবনরক্ষার তাগিদেই যে বিষবর্ষী চক্রধরের বিষ নিক্ষেপের ক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে থম্বে বলেন,—গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার খোলা শুকনো প্রান্তরে বিষবর্ষী চক্রধর বিচরণ করে। খুরি প্রাণীরা.....যেসব প্রাণীর পায়ে খুর আছে তারা জানতে বা অজানতে বিষবর্ষী চক্রধরকে মাড়িয়ে থেঁতলে ফেলতে পারে। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবেই বিষবর্ষীর এই হাতিয়ার। দূর থেকেই বিষ নিক্ষেপ করে সে তাকে করে কাবু। অন্য সাপের মত আত্মরক্ষার উদ্দেশে এ সাপ সাধারণত দংশন করে না। দংশন করার প্রয়োজনও ঘটে না। সম্ভাব্য শত্রু দেখলেই তার চোখে বিষ ছিটিয়ে দেয়। এই ক্ষমতা থাকায় অরণ্যের সকল হিংস্র প্রাণী এই সাপকে সবসময় এড়িয়ে চলে—পাছে তার বিষ এসে পড়ে তাদের চোখে। যত বড় হিংস্র জন্তুই হোক না কেন, তার চোখ যদি হয়ে যায় অন্ধ, তা হলে সে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

অধ্যাপক বেরা থম্বের কথাগুলি নীরবে শুনছিলেন। এবার বললেন,—হ্যাঁ, আমাদের দেশে কেউটে বলে একটি সাপ আছে; সে সাপও দূরে বিষ নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু তার সে ক্ষমতা খুব সীমিত, আর সে ক্ষমতা সে প্রয়োগ করে কদাচিৎ।

রামনাথন মন্তব্য করেন—তা হলে দেখছি, আজকের এই বিষবর্ষী চক্রধরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পশুরাজ সিংহের চোখে বিষ নিক্ষেপ করে সে আমাদের বাঁচিয়েছে!

থম্বে যোগ দেন—অধ্যাপক বেরার চোখেও বিষ নিক্ষেপ করতে সচেষ্ট হয়েছিল সাপটা। আমি যদি ঠিক

সময়ে ধাক্কা দিয়ে তাঁর মুখ ঘুরিয়ে না দিতাম, তাহলে বিপদ ঘটত!

আত্মগতভাবেই যেন রামনাথন বলেন,—এই বিষবর্ষী চক্রধর আমাকে একটি সংগ্রহ করতেই হবে। তবে একে ধরার সাজ-সরঞ্জাম দরকার। আমাদের দেশের চক্রধরকে ধরতে হলে কৌশলে তার ঘাড়টা চেপে ধরলেই হল। কিন্তু বিষবর্ষী চক্রধরকে সেভাবে তো ধরা যাবে না। তার কাছেই যাওয়া চলবে না। চোখে গগলস পরে দূর থেকে নাইলন দড়ির ফাঁস ছুড়ে দিয়ে এ সাপকে ধরতে হবে। এ সাপ থাকলে পশুশালার নিশ্চয়ই কদর বাড়বে।

কদর বাড়বে নিশ্চয়ই; তবে এ সাপ রাখা ঝামেলার ব্যাপার। আমাদের এখানকার পশুশালায় একটি বিষবর্ষী চক্রধর রাখা হয়েছিল। দর্শকরা দেখতে এলেই সে বিষ নিক্ষেপ করত, তা তার খাঁচার কাচের দেয়ালে এসে লাগত। কয়েক দিনের মধ্যেই কাচের দেয়াল হয়ে পড়ত অস্বচ্ছ। তা আবার পরিষ্কার করতে হত। এরকম মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হত। বিষবর্ষীর বিষ কাচের দেয়ালে এত জোরে এসে লাগত যে তার আঘাতের শব্দ প্রায় দু মিটার দূর থেকে শোনা যেত। বক্তব্য শেষ করলেন মিঃ থম্বে।

আর একদিন। তিনজনেই একত্রে যথারীতি বেরিয়েছেন। তিনজনের হাতেই দূরবীন। বেশ কিছুদূরে দেখেন একদল হাতি চরে বেড়াচ্ছে। বিস্তৃত প্রান্তর। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে কোথাও কোথাও মহীরুহ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অধ্যাপক বেরার মনকে আকর্ষণ করে হস্তী-যূথের এই স্বাভাবিক বিচরণ। কিছুদূরে বেশ লতাপাতা ছড়িয়ে একটি গাছ দাঁড়িয়ে। সেই গাছটিকে দেখিয়ে অধ্যাপক বেরা থম্বেকে বলেন,—চলুন, আমরা ঐ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি উপভোগ করি।

থম্বে বাধা দেন, বলেন—এ চত্বরে কোন বড় গাছের তলায় দাঁড়ান নিরাপদ নয়। তাঁর কথা শেষ হয় না। একটি গাছে কচি-কচি সব পাতা বেরিয়েছে। দূরের দলের একটি বাচ্চা হাতি লোভে উঁচিয়ে দিয়েছে তার শুঁড়। কয়েকটা পাতাও টেনে নিয়েছে।

মুহূর্ত মাত্র। কি চিৎকার, কি কাতর আর্তনাদ! কিছুক্ষণের মধ্যেই অমন জলজ্যান্ত জানোয়ারটা মাটিতে পড়ল লুটিয়ে! বড় হাতিগুলো ধেয়ে এল নিমেষে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না! কোন শত্রুপক্ষকেও দেখতে পেল না।

ব্যাপারটা বুঝলেন অধ্যাপক বেরা?—প্রশ্ন করেন থম্বে।

বুঝলাম না! বাচ্চা হাতিটার হঠাৎ কি হল? গাছটার পাতা কি বিষাক্ত?—বলেন অধ্যাপক বেরা।

হঠাৎ রামনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। থম্বেকে তিনি ডাকছেন। তাঁর পিছনে কিছুদূর দিয়ে একটি মোটা গাছের গুঁড়ি গড়সড় করে চলে যাচ্ছিল! সহজেই বুঝতে পারেন তিনি এটি নিশ্চয়ই একটি আফ্রিকায় পাহাড়ি ময়াল।

আমাদের দেশেরই বিশালকায় ময়াল সাপেরই সগোত্র। বিষহীন বটে, তবে তাকত খুব। এ সুযোগ তিনি ছাড়তে চাইলেন না। থম্বেকে সাপটার পেছন দিকে যেতে বলে তিনি ছুটে গেলেন সাপটার মুখের দিকে।

সাপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ময়ালটা তাঁর কোমর পর্যন্ত মাথা তুলে তাঁকে দংশন করতে এল! তিনি দ্রুত পিছনে হঠে গেলেন।

সাপটার মুখ আছড়ে পড়ল মাটির উপর।

রামনাথনের হাতে ছিল সাপ ধরার দু মুখো লাঠি, আর একটি শক্ত কাপড়ের বড় থলে। সাপটার মুখ মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে তিনি লাঠিটা দিয়ে ময়ালটার ঘাড় চেপে ধরলেন। থলেটা মাটিতে রেখে ডানহাতে সজোরে ধরলেন তার মাথাটা।

এদিকে নির্দেশমাত্র থম্বে ছুটে এসে সাপটার লেজ ধরেছেন। অধ্যাপক বেরাও চুপ করে রইলেন না। তিনি সজোরে ধরলেন সাপটার দেহের মাঝখানটা। কৌশলে সাপটার মুখ থলেটার তলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে মুহূর্তে হাতটা বের করে এনে বাইরে থেকেই সাপটার ঘাড় চেপে ধরলেন রামনাথন। তারপর ঠেলে ঠেলে সাপটাকে থলের ভিতর পুরে ফেললেন। থলেটার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

সাধারণভাবে বলা চলে, ময়াল সাপ ধরা খুব কঠিন কাজ নয়। ময়াল যেখানে থাকে, সেখানেই থাকার তার প্রবণতা বেশি। পালায় না। বিষ না থাকলেও তাদের দাঁত খুব ধারাল। সে দাঁত বসাতে পারলে বেশ বড় রকমেরই ঘা হতে পারে। ময়ালকে ধরার নানা পন্থা আছে। সাধারণ পন্থা হল, একখণ্ড কম্বল বা ঐ জাতীয় বস্ত্র সাপটার মুখের সামনে ধরে দোলান। সাপটা যেই সেটাকে কামড়াবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তার ঘাড় চেপে ধরা। অবশ্য সাপটা লেজ দিয়ে হাত জড়াবার চেষ্টা করবে। সেজন্যে লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ধরার জন্যে কাছে একটি লোক থাকলে ভাল হয়।

সেদিন কফি পানের টেবিলে অধ্যাপক বেরা কথাটা তুললেন—বাচ্চা হাতিটা অমন আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কেন মিঃ থম্বে? গাছের পাতাগুলি কি ছিল বিষাক্ত?

এ হল যমের দূত মাম্বা সাপের কীর্তি! আফ্রিকার মাম্বার নাম শুনেছেন তো?—বলেন থম্বে।

হ্যাঁ শুনেছি। ভয়ংকর বিষধর সাপ!—অধ্যাপক বেরা উত্তর দেন।

খুব ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামীও। দৈর্ঘ্যে ৪ মিটার ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছে উঠতে খুব দক্ষ। বৃক্ষবাসী সাপ। সবুজ রঙের। গাছের সবুজ পাতার আড়ালে ছিল। হাতির শুঁড়ের ডগা খুব নরম। কচি পাতার লোভে বাচ্চা হাতিটা শুঁড় উঁচিয়ে দেওয়ায় সে দিয়েছে ছোবল। তাতেই সে কুপোকাত! মাম্বা সাপের উৎপাতের

জন্যে ও এলাকাটি কুখ্যাত।—থম্বে কথাটা পরিষ্কার করেন।

সেজন্যেই বুঝি আপনি আমাকে গাছের তলায় দাঁড়াতে বারণ করেছিলেন?—সোৎসাহে বলেন অধ্যাপক বেরা।

—ঠিকই ধরেছেন। ঐ গাছে মাম্বা সাপ থাকতে পারে, এই আশঙ্কায়। গাছের শাখা-প্রশাখায় ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ে যায়। কোন মানুষের গায়ে পড়লে ভয়ে তাকে ছোবল দেয়। সে দংশনে আর রক্ষে নেই। একেবারে যমের দুয়ার! না জেনে এ চত্বরে গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়ায় বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে মাম্বার দংশনে।

আমাদের দেশের সর্পরাজ শঙ্খচূড়ের দংশনেও হাতির মত বড় জানোয়ার মারা যায়। তবে এ সাপ খুব কমই দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এই সাপের প্রধান বাসস্থান। সেখানকার কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা অরণ্যের ভিতর থেকে বড় বড় গাছের গুঁড়ি চালান দেয়। সেই ভারি গুঁড়ি বাইরে শুঁড়ে ধরে বয়ে আনে হাতির দল। কখনও কখনও শঙ্খচূড়ের দংশনে এসব হাতিদের কেন কোনটি মারা যায়। হাতির শুঁড়ে যেমন নরম অংশ আছে, তেমনি পায়ের পাতাতেও আছে নরম অংশ। এসব স্থানেই শঙ্খচূড় দংশন করে।—অধ্যাপক বেরা যোগ করেন।

অধ্যাপক বেরার কথা শেষ হলে রামনাথনকে উদ্দেশ করে থম্বে বলেন,—আজ আপনি আমাদের দেশ থেকে ময়াল সাপ ধরে সহজে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ২০/২৫ বছর আগে হলে এতো সহজে ধরে নিয়ে যেতে পারতেন না। একটি ঘটনার কথা বলি। হেণ্ডারসন সাহেব এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ময়াল সংগ্রহ করতে। বহু লোকজন সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এক বিশালকায় আফ্রিকান পাহাড়ি ময়াল ধরেছিলেন।

আপনি যে ময়ালটি ধরেছেন, তার দৈর্ঘ্য বড় জোর ৪ মিটার। আর সে ময়ালটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৯ মিটারেরও বেশি। তাঁবুতে এনে খাঁচায় রেখে দিয়েছেন।

সেদিনই ভোর রাতে হঠাৎ.....এ কী! দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের গুমগুম শব্দ! বহুলোকের সরোষ তর্জন-গর্জন! চারদিক দীপ্ত করে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে মশাল। পর্বতবাসী অরণ্যচারী মানুষদের যুদ্ধঘোষণা! কার বিরুদ্ধে? হেণ্ডারসনের কানে আসে তাঁরই বিরুদ্ধে! কি অপরাধ করেছেন তিনি? তাদের সর্পদেবতাকে তিনি ধরে এনেছেন!

কারও হাতে রয়েছে তীর-ধনুক.....কারও হাতে রয়েছে সড়কি.....কারও বা হাতে রামদা! শিঙার নির্ঘোষ! এগিয়ে আসছে তারা। এসে পড়লে আর রক্ষে নেই। সন্ত্রস্ত হেণ্ডারসন। সাদা চামড়ার গর্ব একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই অবশ্য বুঝতে পারলেন তা বাতুলতা মাত্র!

আফ্রিকায় বন্ধুদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন,—এখনই আপনি হাঁটু পেতে বসে সসম্মানে ওদের সর্পদেবতাকে ফিরিয়ে দিন। হেণ্ডারসন অক্ষরে অক্ষরে তাই পালন করলেন। উপরন্তু সর্পদেবতার ভূরি-ভোজের জন্যে গুণাগার হিসাবে দিলেন অনেকদিন ধরে খাইয়ে-দাইয়ে পুষ্ট-করা একটি মেষ। সর্পদেবতার ভক্তরা খুবই সন্তুষ্ট হল। কয়েকজনের কাঁধে চাপান গাছের মোটা গুঁড়িতে সর্পদেবতাকে ঝুলিয়ে সোল্লাসে বিজেতার মত আবার জয়ঢাকে গুমগুম আওয়াজ তুলে ফিরে চলল তাদের ডেরায়। মেষটাকে বগলদাবা করে নিল একজন জোয়ান যুবক।

অধ্যাপক বেরা মন্তব্য করলেন,—আমাদের দেশেও কেউ কেউ জ্যান্ত সাপের পুজো করে। সর্প-সংকুল সব দেশেই সর্পপূজার রীতি আছে। পর্বতবাসী অরণ্যচারী মানুষ স্বভাবতই সাপকে বড় ভয় করত। ভয় থেকে জন্মাল শ্রদ্ধা আর শ্রদ্ধা থেকে ধর্মবিশ্বাস। ভারতীয় ময়ালই বলুন আর আফ্রিকীয় ময়ালই বলুন—খুব বলশালী হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষকে কদাচিৎ আক্রমণ করে। বিশেষ করে, এজন্যেই পর্বতবাসী অরণ্যচারীর ময়ালের প্রতি এত সম্ভ্রম!

বিচিত্র এই বসুন্ধরায়

হীরক দাশ

১৯৫২ সালের ১৬ই মার্চ ভারতমহাসাগরের সিলেওস্ অঞ্চলে প্রায় ৭৩·৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটে। এটি একদিনের বিশ্বরেকর্ড। এছাড়া, ভারতের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে ৩৬৬·১৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের বিশ্বরেকর্ডটি আজও অটুট আছে। এ সঙ্গে জেনে রাখো যে হাওয়াই দ্বীপের কাউয়াই অঞ্চলে বছরের ৩৫০ দিনই বর্ষাকাল। ওখানে প্রায় প্রতিদিনই টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ে।

১৯৫৮ সালের ২রা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস্ অঞ্চলে যে ঝড় (টরনেডো) উঠেছিল তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪৪৮ কিলোমিটারের মতো। এটি স্থলভাগে ঝড়ের গতিবেগের বিশ্বরেকর্ড। এছাড়া, কুমেরুর কমনওয়েল্‌থ-বে অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার গতিবেগের ঝড় প্রায়ই লেগে থাকে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে একটানা ৭৬৫ দিন ধরে সূর্যের উজ্জ্বল মুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর বাসিন্দারা। একটানা সূর্য-উজ্জ্বল-দিনের এটি নাকি বিশ্বরেকর্ড।

মালয়েশিয়ায় একুশ দিন ★ অসিতকুমার চৌধুরী

ব্যাঙ্কক বিমানবন্দর। আমাদের নিয়ে বিমান নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ল। মেঘের সঙ্গে আকাশযানের যেন চলছে লুকোচুরি খেলা। নিচের মানুষজন, রাস্তাঘাট, গাছপালা ঘরবাড়ি সবকিছু অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে আসে। এয়ার হোস্টেস আমাদের লাঞ্চ দিয়ে গেলেন ভাত, সবজি আর মাংস। এখন আমাদের বিমান চলেছে শ্যাম উপসাগরের ওপর দিয়ে। ভাত খেয়ে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, এমনি সময়ে মাইক্রোফোনে শোনা গেল পাইলটের ঘোষণা : আপনারা কোমরের বেল্ট বাঁধুন। আমরা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের এয়ারপোর্টে নামতে চলেছি।

বেলা প্রায় একটা। আমরা পৌঁছলাম কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে। দারুণ গরম, গা-দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ঘাম ঝরছে। আমাদের মধ্যে যারা স্যুট পরেছিল কোট তারা খুলে ফেলল। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে আমরা শহরে যাবার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

বাস এল। এয়ারকন্ডিশান্ড। আমাদের নিয়ে বাস ছুটে চলে কুয়ালালামপুর শহরের দিকে। কুয়ালালামপুর কথাটির অর্থ 'কাদা নদীর মুখ'। পথ চলতি নজরে পড়ে নদীটি—চওড়ায় আমাদের গঙ্গা নদীর অর্ধেক হবে।

শহরটি বেশ সাজানো-গোছানো। আমাদের ঠাঁই হয় এই শহরেরই 'ফেডারেল হোটেল'-এ। এই হোটেলটি একুশতলা। হোটেলটির সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এর একুশতলাটি থিয়েটারের রিভলভিং স্টেজের মতই ঘূর্ণায়মান। এই তলটি এক পাক ঘুরতে সময় নেয় এক ঘণ্টা।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ফেডারেল হোটেলটির ভেতরকার আসবাবপত্তর ও সাজসজ্জা দেখার মত। মেঝে লাল কার্পেটে মোড়া। জানলার পর্দায় চিকনের কাজ করা। প্রতি ঘরে সোফা, চেয়ার-টেবিল, ওয়ার্ডরোব ও ফোন। টেবিলের ওপর রয়েছে চিঠি লেখার সব সাজসরঞ্জাম। ফ্রিজ রয়েছে এককোণে। হোটেলের পেছন দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সুইমিং পুল। বোর্ডাররা সেখানে ইচ্ছেমত জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে, কেউ বা শরীরটা হাল্কা করে জলে গা ভাসিয়ে আছে। বিদ্যুৎচালিত সিঁড়িতে করে চটপট নেমে আসা যায় হোটেলটির দ্বোতলায় বা একতলায়। দ্বোতলায় আছে বিরাট ডাইনিং হল। নাচ ঘর সাজানো ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে। আর হোটেলটির একতলায় আছে নানান জিনিসের শোরুম ও রেস্টুরেন্ট।

পরের দিন শহর দেখতে বার হই। ঠিক সকাল আটটায় বাস ছাড়ে। প্রথমেই যাই 'বাটুকেভস'-এ। কেভস মানে নিশ্চই তোমরা জানো—গুহা, আর 'বাটু' হচ্ছে গুহাটার নাম। দেড়শো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় গুহা দেখতে। অবশ্যি ছোটরা টয় ট্রেনে করে এখানে উঠতে পারে। গুহার ওপরে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির। এগুলি নাকি দক্ষিণ ভারতীয়দের কীর্তি। ওদিন একটা বাটিক প্রিন্টের কারখানাও দেখি—ওখানকার বাটিক প্রিন্টের কাজ সত্যিই চমৎকার।

এরপর শনিবার আমরা যাই কুয়ালালামপুর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে 'পোর্ট ডিকশনে'—রবার চাষ দেখতে। আমাদের দেশে যেভাবে খেজুরের রস সংগ্রহ করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই সংগ্রহ করা হয় তরল রবার। সস্তা হবে শুনে আমাদের অনেকেই রবারের চপ্পল কিনল। এর দাম দুই রিংগীত। রিংগাৎ হল ওদেশের মুদ্রার নাম। আজকাল অবশ্য ওখানকার মুদ্রাকে মালয়েশিয়ান ডলার-ও বলা হয়।

ব্যাঙ্ককের চেয়ে কুয়ালালামপুরে খাবারের দাম অনেক বেশি। ওখানকার মাদ্রাজী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অনেক আছে। এছাড়া আছে শপিং করার জন্য বিরাট বিরাট সব দোকান।

কুয়ালালামপুরে থাকার সময়েই আমরা কজনে মিলে সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করি। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ওখানে যাবার আসল উদ্দেশ্যটা হল—কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করা।

হোটেল থেকে হাঁটাপথে স্টেশানে আসি। ওখান থেকে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ট্রেন ধরব। রাত আটটা নাগাদ ট্রেন ছাড়ল। গোটা রাত্তির বার্থে শুয়ে। অন্ধকারে একের পর এক স্টেশান ছুঁয়ে ট্রেনটি যখন মালয়েশিয়ার সীমান্ত স্টেশান জোহারবারুতে পৌঁছায়, তখন পুব আকাশে ভোরের সূর্য্যি উঁকি দিয়েছে লালজামা গায়ে দিয়ে। এখানে ট্রেনের ভেতরই টিকিট চেকার নিয়ে নিলেন টিকিটগুলো। ভয় হল, সিঙ্গাপুরে যদি আবার কেউ টিকিট দেখতে চায়! সেরকম কিছু ঘটল না, তবে সেখানে পাশপোর্ট চেকিং হল।

সিঙ্গাপুর শহরে ঢুকে চা ও জলখাবার খেতে আমরা একটা দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তরাঁতে ঢুকি। এরপর শহর ঘোরার পালা। সাগর দিয়ে ঘেরা সিঙ্গাপুর শহর। জাহাজের মাস্তুল দেখে মন চায় দূর যাত্রায় সমুদ্রে ভেসে পড়তে—সুমাত্রা, জাভা বা বোর্ণিও। কিন্তু সময় ও সঙ্গতি, দুটিই সীমিত। ও চিন্তা মন থেকে ঝটপট ঝেড়ে ফেলি।

[শেষাংশ ১৯৪ পৃষ্ঠায়]

বিস্মৃতপ্রায় সেই মানুষটি ঃ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে বেশ-বেশ কিছুকাল আগের কথা। অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে বেড়াতে এসেছেন এক-দল সাহিত্যরসিক উৎসাহী তরুণ। এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন তাঁদের কানে এলো, ওই দিল্লিতেই নাকি নিয়মিত প্রবাসী সাহিত্যিকদের জমায়েত বসে, এক সাহিত্যিকের বাড়িতে। কিন্তু কোথায়? চারদিকে অনেক খুঁজেও কোন হদিশ মেলে না।

খুঁজে খুঁজে যখন হতাশপ্রায় সেই তরুণদল, তাঁদের মধ্যেই হঠাৎ একজনের খেয়াল হল, আরে তাই তো! ওই আড্ডায় তো রোজ চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া থাকেই! অর্থাৎ সিঙাড়াই ওখানকার প্রধান 'প্রাণ'! দেখা যাক্ তো কাউকে একবার বাঙালী সাহিত্যিকদের আড্ডার সঙ্গে 'সিঙাড়া' জুড়ে জিজ্ঞাসা করে।

কী আশ্চর্য! সিঙাড়া জুড়ে ফেলতেই ঝটপট বেরিয়ে এলো ওই আড্ডাটির ঠিকানা-ঠিকুজি। তখন—আর কি। খুশিতে ডগমগ করতে করতে তরুণরা পেঁছিলেন সেই আড্ডায়।

আড্ডায় ঢুকেই তাঁরা বেশ বড়সড়ভাবে বর্ণনা করলেন তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। শুনে সেখানকার উপস্থিত সাহিত্যিকরা তো হেসে অস্থির। তখুনি প্রস্তাব হল, আড্ডার নাম দেওয়া হোক্ 'সিঙাড়া সংঘ'। বিপুল ভোটে তৎক্ষণাৎ পাশও হয়ে গেল প্রস্তাবটা। সেইসঙ্গে বাড়ল প্রাত্যহিক সিঙাড়ার বরাদ্দও।

শুনলে অবাক লাগে, দিল্লিতে যাঁর বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বসত এই গরম 'সিঙাড়ার' আড্ডা, তিনি হলেন কিশোর-সাহিত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, দিলখোলা এক মানুষ, যামিনীকান্ত সোম; যাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত পিংলা গ্রামে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখলো শিশু যামিনী। বাবা-মার বড় আদরের সন্তান সে।

চারপাশের চেনা-অচেনা জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো শিশু যামিনী। ছোট থেকেই পারিপার্শ্বিক জগতটার প্রতি কী এক অদ্ভুত টান তার। আত্মভোলা, উদাসীন ছেলে, সমবয়সী অন্য শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

তারপর হঠাৎ একদিন...খোঁজ খোঁজ! যামিনী হারিয়ে গেছে! কতই বা বয়স তখন তার, বড়জোর তেরো-চোদ্দ হবে। গেল কোথায় ছেলেটা?

সংসারে নামে গভীর শোকের ছায়া। এদিকে দিন কেটে যায় মন্থরগতিতে। হঠাৎ একদিন খবর এলো, যামিনীকে পাওয়া গেছে এলাহাবাদে। আবার ফিরে এল সে সংসারে। পড়াশোনা শুরু করলো নতুন উদ্যমে।

১৮৯৬ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন যামিনীকান্ত। ১৯১১ সালে শুরু হল তাঁর কর্ম ও গার্হস্থ্য জীবন, প্রবাস দিল্লিতে। এই প্রবাসজীবন চলেছিল সুদীর্ঘ ৩১ বছর, ১৯১১-৪১।

ইতিমধ্যে অন্তরের তাগিদেই শুরু হয়ে গেছে তাঁর নিভৃত সাহিত্যসাধনা। তিনি সন্ধান পেয়ে গেছেন এমন এক জগতের, যেখানে ঃ

হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ মাখানো আকাশ ভাল,
ঢেউ জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল, বর্ষা ভাল,
ময়লা ভাল, ফর্সা ভাল।...

মোটামুটি তখনই তিনি মনেপ্রাণে স্থির করে নিয়েছেন, কাদের জন্য লিখবেন এবং কী লিখবেন। নীতি ও আদর্শে অবিচল এই মানুষটি জানতেন, বাংলা-সাহিত্যে শিশু-কিশোরদের জন্য তখনও অবধি ভাল গ্রন্থের সংখ্যা নেহাতই অল্প। অথচ এরাই তো দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড। তাই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে এমন সুস্থ বলিষ্ঠ সাহিত্য, যা তাদের সৃজনশীল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে বিরাট জ্ঞানের দিগন্তের দরজা। বিদেশী

সাহিত্যে তো এদের জন্যই লিখে কত সাহিত্যিক বিশ্ব-খ্যাত হয়েছেন, অমর হয়ে রয়েছেন।

সুতরাং দেরি নয়। যামিনীকান্তের কলম চললো ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। লিখতে বসে মর্মে মর্মে তিনি উপলব্ধি করলেন, দেশের যাঁরা মনীষী-মহাপুরুষ, তাঁদের জীবনের আদর্শের দিকটাই তুলে ধরা সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের কাছে। মহৎ জীবনের আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ ধ্রুবতারার মত পথ দেখাবে তাদের।

একে একে তাই প্রকাশ পেতে থাকল ছোট্ট রবি, আমাদের নেতাজী, ছেলেদের বিদ্যাসাগর, সন্ত কবীর, অমৃতময়ী নিবেদিতা...ইত্যাদি অজস্র সব চমৎকার বই। এইসঙ্গে তিনি শুরু করলেন চিরায়ত বিশ্বসাহিত্যের বাংলা রূপান্তর। যদিও সে রূপান্তর বাঙালীয়ানায় সম্পূর্ণ নতুন সৃজনশীল সাহিত্যের রূপ নিল। এমনি-ভাবে একে একে বেরুল 'নীল পাখী' (মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড), ডন কুস্তি (ডন কুইকজোট) ইত্যাদি বই।

১৯৪১ সাল। অবসর গ্রহণ করলেন যামিনীকান্ত। ফিরে এলেন জন্মভূমিতে। হাওড়ার বৈষ্ণবপাড়া লেনে নিলেন বাসাভাড়া। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দিলখোলা আপনভোলা মানুষটি হয়ে উঠলেন সকলের নিজের যামিনীদা। উৎসাহ, পরামর্শ দিয়ে নবীন সাহিত্যিকদের বুকের ভিতরে ঢুকে পড়লেন যামিনীকান্ত।

তারপর এল ২৩শে আগষ্ট, ১৯৬৪ সাল। অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী আপনজনদের গভীর বিয়োগব্যথায় বিষণ্ণ করে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন যামিনীকান্ত সোম।

কিশোর সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ যামিনীকান্ত ছিলেন নিতান্তই প্রচারবিমুখ। সাহিত্য যে পণ্য নয়, এ কথাটা তাঁর বুকের গভীরে ঢুকে ছিল। তাই প্রচারের ঢক্কানিনাদের এই যুগে আত্মভোলা ওই লোকটিকে ভুলতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। আশ্চর্যভাবে ভুলে গেলাম যামিনীকান্তর জীবন ও সাহিত্যের কথা।

কিন্তু ভোলেন নি কয়েকজন। তাঁরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়েই আন্তরিকভাবে শুরু করলেন যামিনীকান্ত সোম জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ছোট-মাঝারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা নতুনভাবে তুলে ধরতে চাইলেন যামিনী-কান্ত সোমের আদর্শবান জীবন ও মহৎ সাহিত্য-কীর্তিকে।

প্রথমেই বলেছি, তাঁদের সামর্থ্য ছিল সীমিত। তাই দৈনিক সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলির কোথাও-ই তেমনভাবে প্রচারিত হয় নি 'যামিনীকান্ত সোম জন্মশতবর্ষ'র কথা। কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তাই সামান্যের মধ্যেই এই শতবর্ষ উদ্‌যাপন লাভ করেছিল পরিপূর্ণতা। এ ব্যাপারে যামিনীকান্ত সোম জন্মশত-বার্ষিকী কমিটির সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

এই জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন একবছর পর শেষ দল গত ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮২ তারিখে, হাওড়ার টাউন হলে। এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, নবীন-প্রবীণ বেশ কিছু সাহিত্যরসিকদের মাঝে যামিনীকান্ত সোমের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো ও দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বপনবুড়ো সরস ভঙ্গিতে গল্পের ঢংয়ে বলে চললেন যামিনীকান্তর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত গভীর সৌহার্দ্যের কথা। সেইসঙ্গে তিনি তুলে ধরলেন যামিনীকান্তর বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ও তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিক-গুলির কথা।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, সুস্থ বলিষ্ঠ কিশোর সাহিত্যের জন্যই যে মানুষটি সারাজীবন কলম ধরলেন, তাঁকে বাঙালী ভুলতে বসেছে। এজন্যই প্রয়োজন ছোট-দের জন্য যাঁরা কলম ধরেন, তাঁদের সকলের একটি শক্তিশালী সংগঠন। তারপর জোরালো ভাষায় তিনি বলেন, যামিনীকান্ত শিশু-সাহিত্যিক নন, তিনি লিখেছেন চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরদের জন্য। শিশু-সাহিত্য কথাটার অযৌক্তিকতা নিয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন।

অন্যান্য বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী অচল ভট্টাচার্য, উৎপল হোমরায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অজিত দাস, দিলীপকুমার বাগ প্রমুখ সাহিত্যসেবীরা।

এঁদের সকলের সঙ্গে এসো, আমরাও কিশোর সাহিত্যে উৎসর্গপ্রাণ বিস্মৃতপ্রায় মানুষ যামিনীকান্ত সোমের জন্মশতবর্ষে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মালয়েশিয়ায় একুশ দিন

[১৯২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সিঙ্গাপুর হচ্ছে 'ডিউটি ফ্রি' পোর্ট এলাকা। তাই এখানকার সব জিনিসই দামে খুব সস্তা। এখান থেকে টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কিনে, আমরা এবার হাঁটা দিই ফিরতি পথে।

সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পথে ঘটল বেশ বিপত্তি। কুয়ালালামপুরে যাওয়ার ট্রেনে বসে আছি, কিন্তু ট্রেন নট নড়নচড়ন। জোহারবারুতে নাকি একটি ট্রেন লাইন থেকে পড়ে গেছে, তাই রেলপথ জ্যাম। লাইন না ক্লিয়ার হওয়া পর্যন্ত ট্রেন ছাড়বে না। অগত্যা সারারাত আমরা ট্রেনের বার্থে বসেই সময় কাটাই।

হাসি আর গানে মালয়েশিয়ায় একুশদিন কাটিয়ে, আমরা একুশজনে এবার আকাশযানে পাড়ি দিই পশ্চিম জার্মানি।

বিজ্ঞানীর দপ্তর

নিজে করো ঃ

★ *গঙ্গেশ ঘোষ ও মদন মুখার্জী*

।। বিস-কুটকুট কুটকুট ।।

ভোরের দিকে এখন বেশ শীত শীত করে। এই সময়ে গুটিসুটি হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম—আ ! তোফা !! কিন্তু সামনে পরীক্ষা, তাই সব মজাই মাটি। লাল্টু আর পল্টু রাগে গরগর করতে করতে বিছানা ছেড়ে ওঠে। রাতে ধরা টাইম কলের ঠাণ্ডা জলে যাহোক তাহোক করে দুজনে মুখ ধুয়ে ফেলে।

এরপর চায়ের সঙ্গে বরাদ্দ বিস্কুট দেখেই তো লাল্টুর মেজাজ গরম !

—পল্টু রোজই বড় বিস্কুট পাবে, আর আমার ভাগে রোজই ছোট—।

ঠামমা অনেক করে বোঝায় ঃ একই কোম্পানীর বিস্কুট কি ছোটবড় হতে পারে ?

কে শোনে কার কথা। লাল্টুর কান্নার আওয়াজ তখন ঘর ছাপিয়ে দালান, তারপর দালান পেরিয়ে ছোটকা'র ঘরে এসে হয়েছে হাজির।

এবার লাল্টুর মোকদ্দমা উঠল ছোটকা'র আদালতে। বিচারকের মন রাখতে লাল্টু ছোটে পুরো এক গ্লাস গরম চা আনতে। চা-টা খেয়ে ছোটকা এবার মুখ খোলেন ঃ অভিযোগ হল একটা বিস্কুট বড় আর অন্যটা ছোট। আমরা দেখব এই বিস্কুট দুটোর মধ্যে সত্যিই ওজনগত কোনো পার্থক্য আছে কি না। তাই এখন আমার দরকার খুব সূক্ষ্ম একটা ওজন যন্ত্র।

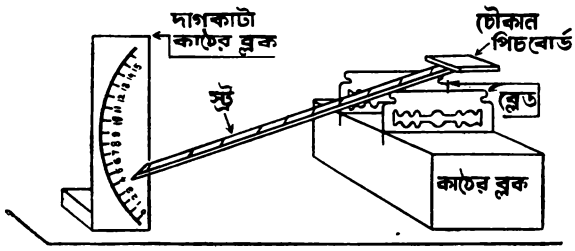

ছোটকা প্রয়োজনীয় জিনিস যা চাইলেন ঃ একটা কাঠের ব্লক (ওটি ছবির মত করে কেটে দাগ দিলেন), স্ট্র, দুটো ব্লেড, একটা পেন, আর একটা কাঠের ব্লক, আর ছোট্ট চৌকোন পিচবোর্ড। এই জিনিসগুলি হাতে এলে পর, ঠিক ছবির মত করে সবকিছু সাজান হল। তৈরি হল একটা মজার ওজন যন্ত্র।

দুজনের বিস্কুট দুবার চাপান হল ওজন যন্ত্রে। শেষ পর্যন্ত মামলার রায় গেল লাল্টুর বিপক্ষে।

ছোটকা'র কাঁচা ঘুম ভাঙানোর দায়ে অভিযুক্ত লাল্টু এবার ব্যাজার মুখে কষতে বসে বাড়তি আরেক প্রশ্নমালা অঙ্ক।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ?

দক্ষিণ মেরুতে ধূলি নেই

পরেশ দত্ত

ধূলি ধোঁয়া মুক্ত আবহাওয়ার কথা শহরের মানুষ ভাবতেও পারে না। গ্রামও সম্পূর্ণ ধূলি ধোঁয়া মুক্ত নয়। প্রতিদিন টন টন ধূলি আবহাওয়া থেকে নিচের পৃথিবীতে এসে জমছে। চিরতুষারাবৃত দক্ষিণ মেরু বা আন্টার্টিকা এক অজানা রহস্যের জগৎ। এখানে এক কণাও ধূলি বা ধোঁয়া নেই। মেরু অভিযাত্রীরা দেখেছেন তুষারাস্তীর্ণ সমুদ্র ও স্থল ভাগ অমলিন শুভ্রতায় ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কানে ভাসে শিল্পীর তুলির শেষ টানের মতো সৃষ্টিকর্তা যেন এই মাত্র দক্ষিণ মেরু গড়া শেষ করেছেন। অথচ এই সব শক্ত বরফ বিশ হাজার বছরের পুরানো।

ধূলি না থাকার জন্য দক্ষিণ মেরু এক বিচিত্র

ধাঁধার জগৎ। সম্পূর্ণ ধূলিমুক্ত বাতাসের মধ্যে দিয়ে বহুদূরের দৃশ্য ও দূরবীনে দেখার মতো খুব স্পষ্ট দেখা যায়। শহরে বা গ্রামে আধ মাইল দূরের মানুষ খুব অস্পষ্ট। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে মনে হয় যেন মানুষটি সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে যে বস্তুটি মনে হয় মিনিট তিনেক দূরের পথে রয়েছে আসলে সেখানে পেঁছিতে বিশ মিনিট লেগে যাবে।

দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপ মাত্রা শূন্যের নীচে ১২৬° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে যায়। ফলে দক্ষিণ মেরু চাঁদের মতোই প্রাণ চিহ্নহীন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসও বাঁচতে পারেনা। রুশ বিজ্ঞানী জানিয়েছেন দক্ষিণ মেরুতে যত ঠাণ্ডায় থাক, এখানে সর্দি বা টনসিল নেই।

উড়ুক্কু সাপ ● পরেশ দত্ত

বর্মা, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো অরণ্যে এমন এক প্রজাতির সাপ দেখা যায় যাদের নাম উড়ুক্কু সাপ। ল্যাটিন নাম—CHRYSOPELAORNATA. যদিও এরা ঠিক বাদুড়ের মতো উড়তে পারে না, কিছুটা দূর পর্যন্ত এরা বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছুটো ছুটি করতে পারে। উঁচু ডাল থেকে অনায়াসে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কাঠ বিড়ালীর মতো গাছের এক ডাল থেকে বা এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফাতে পারে। উড়ুক্কু মাছ লম্বায় দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। এক আশ্চর্য কৌশলে উড়ুক্কু সাপ তার দেহ চ্যাপ্টা করে ফেলে। ফলে বাতাসে অনেকটা সাঁতার কাটতে পারে ও পতন রোধ করতে পারে।

মাথা থেকে লেজের কাছাকাছি পর্যন্ত দেহের দু'দিকে এদের ঝিল্লিকূপ আছে। দুদিকের পাঁজর বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে পেট ভেতরে টেনে নেয়। ফলে দেহ ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়ে যায়। তখন ওপর থেকে নিচে পড়লেও তেমন আঘাত লাগেনা।

প্রধানতঃ এরা টিক টিকি জাতীয় প্রাণী খায়। উড়ুক্কু সাপ বেশ হিংস্র। ধরতে গেলে ছোবল মারে, দংশন করে। উড়ুক্কু সাপের রং বিভিন্ন। দেহ কালো বা সবুজ। তার ওপর পীত বা কমলা রঙের নক্সা। কালো মাথায় হলুদ চিহ্ন। অনেকের মতো উড়ুক্কু সাপ দক্ষিণ মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকাতেও বাস করে।

বিজ্ঞান বিস্ময়

জীবনের উৎস সন্ধানে নতুন তত্ত্ব

পরেশ দত্ত

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা ১৮ থেকে ২০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন=১ লক্ষ কোটি) বছর আগে মহাবিশ্বের জন্ম। কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সূর্যের জন্ম পাঁচ বিলিয়ন বছর আগে আর পৃথিবীর জন্ম পাঁচ হাজার মিলিয়ন বছর আগে।

পৃথিবী ও সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের জন্মসূত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ভিন্ন মত। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা মহাকাশে একটি দৈত্যাকার নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে সৌরমণ্ডলীর জন্ম। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যের চারিদিকে গ্যাসীয় নেবুলা থেকেই সৌরমণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহের জন্ম।

আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর জীবনের বিকাশ ঘটেছে দেড়শো কোটি বছর আগে। তার পূর্বে প্রাণহীন পৃথিবী গ্রহের আবহমণ্ডলে অক্সিজেন ছিলনা। পৃথিবীর আকাশে ছিল শুধু মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প, আর ছিল অ্যাসিটিলিন ও হাইড্রোজেন সাইনাইড গ্যাস। আদি পৃথিবী ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই হিলিয়াম, যুক্ত-হাইড্রোজেনের মতো অতি লঘু গ্যাস হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। তবে ভারি গ্যাসের অণু, যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও আরও কিছু ভারি গ্যাস রয়ে গেল পৃথিবীর আবহমণ্ডলে। হাইড্রোজেন গ্যাস রয়ে গেল একমাত্র অক্সিজেন রাসায়নিক যৌগের মধ্যে।

কিন্তু জড় পৃথিবীতে প্রাণের চিহ্ন এলো কোথা থেকে এই বিষয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে গবেষণার আজও শেষ হয় নি। কেউই স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারেন নি। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মতে মহাকাশে কোনো মৃত নক্ষত্রের বিস্ফোরিত ভগ্নাবশেষ ধূমকেতুর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের চিহ্ন এনে দিয়েছে। ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যের কক্ষপথে লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[শেষাংশ ১৯৮ পৃষ্ঠায়]

মফিকুল হাসান

গ্রামের নাম মাদপুর

শুধু 'মাদপুর' বললে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে। দূরবর্তী সাধারণ মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনক। ধরতব্যের বাইরে চলে যায়। মাদপুরের সঙ্গে লেজুড় হিসাবে যোগ করে দিতে হয় 'কলাপুকুর'কে। মাদপুর-কলাপুকুরে বললে তবেই বোধগম্য হয় স্থানটি কোথায়।

হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে পেঁছান যায় বৈদ্যুতিক ট্রেনে বা দ্রুতযান বাসে। তারকেশ্বরের সন্নিকটে বালিগোড়ী অঞ্চল আর বালিগোড়ীর বাহুর মধ্যেই মাদপুর। মাদপুর—কলাপুকুর।

আগে বালিগোড়ীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একটি সরু আলপথ মাত্র। অতিকষ্টে সেই পথ অতিক্রম করে বালিগোড়ীতে আসা যেত। বর্ষায় মাদপুরে যাওয়া বড় কষ্টসাধ্য ছিল।

হালফিলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বনজঙ্গল আজ আর নেই। সেই আলপথও নেই। আজকের রাস্তা আট হাত চওড়া। বালিগোড়ী থেকে সরাসরি রিক্সা আসে মাদপুরে। রিক্সা বা জীপ আজকাল আর তেমন করে মাদপুরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে না।

সাধারণ মানুষ জানে ডাকাতিয়া খালের পূর্বদিকটাই মাদপুর এবং এর উত্তর দিকে কলাপুকুর। আবার এই কলাপুকুরের বুকচিরে চলে গেছে ডাকাতিয়া খাল, যার ফলে কলাপুকুরের দুটি ভাগ সৃষ্টি হয়েছে। একটি পূর্বপাড়া এবং অপরটি পশ্চিম পাড়া। কিন্তু ডাকাতিয়া খালের পশ্চিম দিকে দুই-এক ঘর বাসিন্দা আছে তারা মাদপুর গ্রামের অন্তর্গত। অথচ এই দুই-এক ঘর বাসিন্দাদের পূর্বদিকে কয়েকঘর আদিবাসীর বাসবাস করে রয়েছে যারা নাজিরপুর বাসী। তারা মাদপুরের অধিবাসী নয়। এ এক মজার ব্যাপার।

আগে এই ডাকাতিয়া খালের ব্রিজের পূর্বদিক এখনকার মত জমজমাট ছিল না। কয়েকঘরের বসবাস ছিল মাত্র। আজ সেখানে মুদির দোকান বসেছে দুটি। চায়ের দোকান দুটি, একটি সেলুনও তৈরি হয়েছে। স্থানীয় একব্যক্তির ধানভানা কল বসানর জন্য জায়গাটি আরও সরগরম হয়ে উঠেছে। সব সময় বাজার বাজার ভাব। এখানে আবার দুটি হাতুড়ে ডাক্তার তাঁদের আস্তানা তৈরি করে বেশ জমিয়ে বসেছেন। এরা অবশ্য পাশ করা ডাক্তার নয় কম্পাউণ্ডারী করতে করতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আজ গরীব ছাপোষা মানুষের সেবায় নিযুক্ত। এখান থেকেই মাদপুরের শুরু বলা যায়। তাই এঁদের কথাই আগে এসে গেল।

এবার ঢুকে পড়ুন গাঁয়ের ভেতরে, খেলার মাঠ আর গোরস্তান পিছনে রেখে চলে যান—দেখবেন একটির পর একটি পুকুর। এখন সব পুকুরের জল কমে গেছে। কাতলা মাছগুলো হাঁসফাঁস করছে। এইসব পুকুরগুলোর পাড় দিয়েই বয়ে গেছে সর্পিলাকার মেঠোপথ। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় পথটির রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

কত বাঁশ বাগান! কলাপুকুর থেকে একটা খাঁ খাঁ মাঠ পেরিয়ে ডোমেরা আসে বাঁশ কিনতে। ঐ গ্রামের জব্বার ভাই তো বাঁশের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। ভাল লাভ পায়। আর বাঁশ বাগানের মালিকও লাভবান হয়। একবারেই নগদে একশ-দেড়শ টাকার বাঁশ বেচে সেই টাকা কাজে লাগাতে পারে।

কত পুকুর রয়েছে। সব পুকুরের মালিকই মাছ চাষ করে না। কোন গরীব লোককে আবার ভাগে দিয়ে দেয়। সেও কিছু পয়সা পায়, মালিকও ঝামেলামুক্ত। কিন্তু এক শিশি বিষাক্ত ওষুধ ঢেলে দিলেই মাথায় হাত। এই সেদিন মহাদেবদার পুকুরে বিষ ঢেলে দিল সন্ধ্যারাতেই। মাছের সে কী লাফানি। বেচারা

মহাদেব জমি জায়গা ভাগে চাষ করে। ইদানীং কয়েকটি পুকুরও নিয়েছে। এখন তার মাথায় হাত!

গ্রামের বেশিরভাগ লোকই কৃষি নির্ভর। এঁদের অনেকেরই নিজের গরু ও লাঙল আছে। ভোরে সবাই লাঙল কাঁধে মাঠে যায়, আর ফেরে সে—ই সাঁঝবেলায়।

গাঁয়ের শেষ সীমানায়, পুবদিকে যেখানে সূর্য্যি ওঠে—গোবেচারার মত দাঁড়িয়ে আছে টিনের চালার ইস্কুল বাড়ি। তার চালে শত-সহস্র ছেঁদা, বর্ষাকালে জল পড়ে টাপুর-টুপুর করে। আদিবাসী ছেলেরাও এখন গাঁয়ের ইস্কুলে হাজির হচ্ছে দল বেঁধে। শিক্ষক-মশাইকে এরা বলে 'এই মাস্টার পড়া নিয়ে যা' বা, 'মাস্টার তোর কথা আমি শুনব না'। মেয়েরা প্রায় আধঘন্টার পথ পায়ে হেঁটে বালিগোড়ীর মাধ্যমিক স্কুলে যায়।

আদিবাসী তরুণদের মধ্যে কয়েকজন সিভিল ডিফেন্সে চাকরি করে। দু জন রেলের গ্যাংম্যান। একজন আবার ডি এম এস। তার ডাক্তারখানা অবশ্যি এ গাঁয়ে নয়—কিছুটা দূরে অন্য এক অঞ্চলে।

নজবুল সরকার স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি। কয়েক বৎসর হ'ল ট্রাক্টর কিনেছে। নিজের চাষও হবে, আবার সেই সঙ্গে ভাড়াখাটাও হবে। বেশ রোজগার হয়। বর্ষার সময় মাঠেই দিন কাটে, ঘরমুখো হবার অবকাশ পায় না। সাধারণ চাষীরাও ট্রাক্টরে তাড়াতাড়ি জমি ঠিক করে নিতে পারে। কিন্তু ভাড়ার টাকা সহজে নজবুলের হস্তগত হয় না। একমাস দেড়মাস বা তারও পরে ভাড়ার টাকা আদায় করে। এখন অবশ্য বেশ কয়েকটা ট্রাক্টর হয়েছে। তাই গ্রামের চাষ তুলে এরা বাইরের অন্য কোন গ্রামে চলে যায় ভাড়া খাটতে।

গাঁয়ে পোস্টাপিস হয়েছে, বেশ চলছে তা। দূরের শহর এখন ধরা পড়েছে গাঁয়ের চিঠির থলিতে। এমনি করেই এখন চলছে শহর ও গ্রামের মন জানাজানি। তারপর হয়ত একদিন এই গ্রামই দাঁড়াবে শহর ঘেঁষে।

বিজ্ঞানীর দপ্তর

[১৯৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ধূমকেতুর মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাণ সৃষ্টি হয়। যে অবস্থা আদিম পৃথিবীতে ছিলনা। বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি বছর অন্ততঃ ১০০০০ টন ধূমকেতুর পদার্থ পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে।

অনেক মহাকাশ বিজ্ঞানীর মতে উল্কা থেকে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটে। উল্কার মধ্যে কার্বন সমৃদ্ধ এমন অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা পৃথিবীতে আদি প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক।

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি সমুদ্র বিজ্ঞানীরা একটি নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে পৃথিবীতে সূর্যের সাহায্য ছাড়াই চির অন্ধকার সমুদ্রতলের উষ্ণ স্রোত অঞ্চলেই প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিল।

মহাসমুদ্র গবেষণার এক বৈজ্ঞানিক কমিটি কানাডায় সারা বিশ্বের সমুদ্র বিজ্ঞানীদের এক যুক্ত সম্মেলনে এই নতুন তত্ত্ব পেশ করেন।

গভীর সমুদ্রতলের যে অঞ্চলে কোনো সময়েই সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, সেই চির অন্ধকার রাজ্যের উষ্ণ সমুদ্রস্রোত অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে তাঁরা বহু বহিরাগত প্রাণী ও প্রাণ চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করেই এই নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি। সমুদ্র-তলের এই উষ্ণ স্রোত সমুদ্রতলের কঠিন আবরণের মধ্যে দিয়ে আবর্তন করে সমুদ্রতলে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যালিফোর্নিয়ার উপসাগরে ও গ্যালাপাগাস দ্বীপের উত্তরপূর্বে এই রকম বিশেষ উষ্ণ স্রোত অঞ্চল খুঁজে বার করেছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। এই সব অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা বিস্তৃত প্রাণের চিহ্ন পেয়েছেন। এদের মধ্যে আছে দাড়াওয়ালা কাঁকড়া, ঝিনুক ও এক ধরনের কেঁচো জাতীয় প্রাণী। এই সব বিশেষ ধরনের প্রাণী সমুদ্রতলের বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে প্রাণ ধারণে অভ্যস্ত। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের ধারণা সমুদ্রের গভীরে এই সব অন্ধকার রাজত্বে কোটি কোটি বছর আগে প্রাণ সৃষ্টির উপযোগী প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মনুষ্যবিহীন বিশেষ যানে মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা নামিয়ে দেয়া হয় গভীর জলে। ক্যামেরার ছবি ও মাইক্রোফোনের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে সমুদ্রতলে পলিমাটি ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর কাঁকড়া ও কেঁচো জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব জানা গেছে। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের ধারণা ২৬০০ মিটার নিচের চির অন্ধকার অঞ্চলেও সূর্যের আলো ছাড়াই প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুবরেখার উত্তর অঞ্চলেও গভীর সমুদ্রের নিচে উষ্ণ স্রোত অঞ্চলেও এই রকম আশ্চর্য প্রাণ চিহ্নের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাঠক পাঠিকার আসর

রাজুর ইঁদুর

অলোক সেন

রাজু আজ বেজায় খুশি। সঞ্জিবদের বাড়ি থেকে দুটো সাদা ইঁদুর এনেছে। ইঁদুর দুটোর নাদুসনুদুস চেহারা, গায়ের রং ধপধপে সাদা। ঘরে একটা ভাঙা কাঠের বাক্স ছিল। সেটাই কিছু মেরামতি করে তারের জাল লাগিয়ে ওর ভেতরে ইঁদুরদের থাকার ব্যবস্থা করেছে রাজু।

মাটির ভাঁড়ে জল, আর কয়েক টুকরো রুটি রাজু ছড়িয়ে দেয় কাঠের বাক্সের ভেতর। ইঁদুর দুটো নিজেদের মধ্যে হুটোপাটি করে খেলছে, আর মাঝে মাঝে রুটির টুকরো কুটকুট করে ছিঁড়ছে। দুচোখ বড় বড় করে ইঁদুরদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে রাজু।

মা তাড়া লাগান ঃ রাজু বাবা, চান করতে যা—।

রাজু কাঠের বাক্স ছেড়ে আর উঠতে চায় না। শেষে বাবার ধমক খেয়ে সে চান করতে যায়।

আজ রবিবার। স্কুল ছুটি। একটা মোড়ার ওপর বসে সারা দুপুর ইঁদুরদের রকমারি খেলা দেখে রাজু। বিকেল হলে বন্ধুরা ডাকতে আসে রাজুকে। রাজু বাক্স ছেড়ে ওঠে না। ও আজ খেলবে না, বেড়াতেও যাবে না। যদি সে চলে যায় তবে ইঁদুর দুটোকে দেখাশুনো করবে কে ?

ঘর থেকে চাল এনে রাজু ছড়িয়ে দেয় বাক্সের ভেতর। ইঁদুর দুটো কুটকুট করে খায়। রাতে চট দিয়ে কাঠের বাক্সটা ঢেকে দেয় রাজু।

ইতিমধ্যে মাস কয়েক কেটেছে। ইঁদুর দুটোও দেখতে-শুনতে হয়েছে বেশ বড়। এখন কাঠের বাক্স খুলে দিলে, ইঁদুর দুটো নিজেরাই এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে কুটকুট করে কী যেন সব খায়। রাজুর হাতের ওপর উঠে আসে ও দুটো। চিকচিক করে শব্দ করে মুখে। বিস্কুট ভেঙে দেয় রাজু। ওরা কুটকুট করে খেয়েই ছুট দেয় বাক্সের ভেতর।

স্কুলে যায় রাজু কিন্তু তার মন পড়ে থাকে বাড়িতে। ইঁদুরদের কথা সর্বক্ষণ তার মন জুড়ে থাকে।

একদিন অঘটন ঘটে।

রাজু স্কুলে গেছে। আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। এলোমেলো হাওয়া...। ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ চমকায়, কড় কড়াৎ.....কড় কড়াৎ কী ভয়ংকর বাজ পড়ার আওয়াজ !

মাস্টারমশাই ঘরে নেই, তাই ক্লাসের ছেলেরা করছে তুমুল হৈচৈ। ইঁদুরদের কথা ভেবে রাজুর মন খারাপ, সে বসে আছে চুপচাপ। বারান্দাটা ঢাকা নয়, নির্ঘাৎ বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে ইঁদুরদের বাক্সে—। এসব কথা যত ভাবে ততই রাজুর মন খারাপ হয়ে যায়।

বৃষ্টি থামলে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। রাজু প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌঁছোয়—।

ঝড়ের দাপটে কাঠের বাক্সটা বারন্দা থেকে ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বাড়ির উঠোনে। খাঁচার কাঠের কপাট হাঁ-করে খোলা। একটা ইঁদুর ঠ্যাং ছড়িয়ে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে, অন্যটা পড়ে আছে একটু দূরে—ওটার গা খুবলোন। এসব কোন বেড়ালের কাণ্ড।

রাজুর দু চোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা। কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজু। সে যে বড় ভালবেসে ফেলে-ছিল ইঁদুর দুটোকে.....।

জলসা

গৌতম গলুই

শেয়াল ভায়া খেয়াল গেয়ে
করল পাড়া মাত,
বাঘ বাবাজি গোঁফ পাকিয়ে
বলল কেয়াবাত।

বেবুন ভায়া হেঁড়ে গলায়
গান করল শুরু,
ভালুক হাসে ফিকফিকিয়ে
নাচায় জোড়া ভুরু।

● সুজনবন্ধু ●

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

আনন্দ হালদার, লক্ষ্মীকান্তপুর, চব্বিশ পরগণা থেকে লিখছে ঃ

গত নভেম্বর ১৯৮২ সংখ্যা থেকে কিশোর ভারতীতে যে বিতর্ক শুরু হল, তাতে যোগ দিতেই আমার এ চিঠি। প্রথমতঃ হৃদয় ঘোষালের আশ্চর্যজনক চিঠি। তিনি 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ঠেকাতে যেসব অস্ত্র প্রয়োগ করার কথা বলেছেন, তাতো ফ্যাসিজমেরই প্রকারভেদ। উনি কি এটুকুও জানেন না যে, উপর থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়াটা মূর্খামিরই নামান্তর, তাতে ক্ষতিই হয়।

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। জানি না, পড়ে আমার অন্য বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হবেন কিনা। আমার যা মনে হয়েছে, তাই-ই লিখছি।

অতীত ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আমরা দেখি, ভারতবর্ষ বলে মূল ভূমি নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি সেখানে বিভিন্ন রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্বশাসিত অঞ্চল গড়ে তুলেছে। তারপর শক্তিশালী ইংরেজরা পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রাখল আমাদের। সেইসঙ্গে সে সময়েই তৈরি হল এক রাজতন্ত্রের শাসনে অখণ্ড ভারতবর্ষ।

আমার বক্তব্য, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পরে এক-সঙ্গে বিভিন্ন জাতিদের থেকে কি কোন লাভ হয়েছে? উল্টে ক্ষতিই তো হয়েছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের হাতে মূল ক্ষমতা। সেই সুযোগে কেন্দ্রে যে জাতির লোকদের প্রাধান্য, সেই জাতির প্রতি কেন্দ্র হয়েছে অকৃপণ, দরাজ হস্তে টাকা ঢেলে সেই রাজ্যকে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন সাজে। অপরদিকে যে রাজ্যগুলি ছোট, কেন্দ্রে তাদের প্রতিনিধিও কম, তারা সুযোগ না পেয়ে অবহেলায় পড়ে পচে মরছে।

কাগজপত্রে সর্বত্র আসামের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন নিয়ে খুব সোরগোল উঠেছে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, অসমীয়াদের এ আন্দোলনের সঙ্গত কারণ রয়েছে। আসামে যেসব সরকারী অফিস-কাছারি রয়েছে, তার বেশিরভাগেরই মাথায় যাঁরা বহাল তবিয়তে বসে আছেন, তাঁরা অনসমীয়া। ব্যবসাপত্রের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশির ভাগই অসমীয়া নন। তাহলেই দেখুন সুজবন্ধু, অসমীহারা অবিচ্ছিন্ন ভারতে পড়ে পড়ে মারই খাচ্ছে, বিকাশলাভের কোন সুযোগই পাচ্ছে না।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা কমবেশি সত্য। এখানেও আমরা দেখছি একই চিত্র। চাকরির অভাবে শত শত যুবক বেকার হচ্ছে, কুপথে নেমে মস্তান, ওয়াগানব্রেকার হচ্ছে, এদিকে রাজ্যের টাকা মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবী, গুজরাটিরা লুঠে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

তাই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমার মনে হয়, সমাজব্যবস্থার এই ভাঙনের যুগে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' কথাটা নেহাতই ভেক। এই এক এবং অবিচ্ছিন্ন ভারত থাকাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ হচ্ছে না। এ ব্যাপারে অন্য বন্ধুদের মতামত জানতে চাই। সবশেষে চাই আপনার বক্তব্য। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

সৌম্যব্রত ভট্টাচার্য, সত্যেন রায় রোড, কলকাতা-৩৪ থেকে লিখছেন ঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, নভেম্বর সংখ্যায় হৃদয় ঘোষালের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য পড়ে খুব বিচলিত বোধ করছি। বিচ্ছিন্নতাবাদের সমাধানসূত্র হিসেবে তিনি জরুরী অবস্থাজারির কথা বলেছেন। কিন্তু গত জরুরী অবস্থার কলংকময় অধ্যায় কি তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত? তিনি কি ভুলে গিয়েছেন যে সেই এমার্জেন্সী শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির লীলাক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, লোডশেডিং নেই, সবকিছুর নিয়মিত সরবরাহ দেখে ভেবেছি, জরুরী অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু মাননীয় হৃদয়বাবু, শ্রমিক ও গরীব মানুষ, যারা ক্ষেতে-কলকারখানায় রক্ত ঝরায়, তাদের অবস্থা সেসময়ে দেখেছিলেন? মনে হয় দেখেন নি!

জরুরী অবস্থা জারি হলে রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হবে ঠিকই, তাই বলে পুলিশ-মিলিটারী কি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বদা কাজ করবে? আর দেশের সব

রাজনৈতিক দলই যদি নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে ক্ষমতাসীন দলের কাজের সমালোচনা হবে কি করে? আর সর্ষের মধ্যেই যে ভূত নেই, তাই বা কে বলতে পারে? এই বিচ্ছিন্নতাবাদের পেছনে শাসকসম্প্রদায়েরই তো ব্যক্তি বিশেষের হাত থাকলেও থাকতে পারে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা জারি করলে এই সমস্যা সমাধান হওয়ার পরিবর্তে তা আরও জটিল ও সমাধানের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

আর সম্মিলিত দলের প্ল্যাটফর্ম বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ভারতে কংগ্রেস ব্যতীত কি দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক দল, আদর্শ, নীতি নেই? কাজেই সবাই সেসব ভুলে কেন কংগ্রেসে মিলিত হবেন?

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় আজ নেই যে আসাম, পাঞ্জাবে অবস্থা জটিল, 'আমরা বাঙালী' খোদ পশ্চিমবঙ্গেও পরিস্থিতি জটিল করতে চাইছে। কাজেই এটা এখন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির গুরুতর প্রশ্ন। শুধু মিলিটারী ও পুলিশ ব্যবহার করলেই এই বিক্ষোভ থামানো যাবে না, এর জন্য চাই দেশের প্রতিটি মানুষের সুস্থ রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি।

সুজনবন্ধু ও অন্যান্য বন্ধুদের মতের অপেক্ষায় থেকে এইখানেই আমার চিঠি শেষ করছি।

সাম্প্রতিক সংবাদ

অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার দুর্নিবার আকর্ষণই মানুষের সভ্যতার গতিকে করেছে দুর্বার। যুগে যুগে অজানাকে জানবার, তাকে করায়ত্ত করার দুর্দম বাসনা নিয়ে দেশে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছেন বহু অভিযাত্রী, যাঁদের কেউ কেউ হারিয়েই গেছেন রহস্যময় অজানার গভীরে চিরকালের মত। তবু মানুষ দমে নি, ভয় পায় নি।

নতুন উদ্যমে বুক বেঁধে আবার তোড়জোড় করেছেন নতুন অভিযাত্রীরা। আতঙ্ক ভয়, জাগতিক ভোগের প্রলোভন কোন কিছুই তাঁদের ঠেকাতে পারে নি। তাই তো আমরা দেখি, ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে সুদূর অতীতের বিজয়সিংহ, অতীশ দীপঙ্কর ইত্যাদি এবং পরবর্তীকালের কলম্বাস, পিয়ারী, স্কট, আমুন্ডসেনের নাম।

সম্প্রতি ভারত সরকারের আনুকূল্যে 'হিমালয়ান ক্লাব' বিরাট দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এক রোমাঞ্চকর অভিযানে। সে অভিযান হিমালয়ের বুকে অজানা উপত্যকা 'নিয়োরা'য়।

এই অভিযানে শুধু হিমালয়ান ক্লাবের সদস্যরাই নন, এতে সামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষরাও। ছিলেন জুওলজিক্যাল সার্ভের ডঃ কাক্কারের নেতৃত্বে ছয়জন বিজ্ঞানী, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন দত্তসহ দুজন জওয়ান, ডাক্তার সাহা এবং দুই তরুণ উদ্ভিদ-গবেষক রাস্তোগী ও পুরকাইত। দলের কর্ণধার ছিলেন কমল গুহ এবং প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ছিলেন কিশোর চৌধুরী। সবমিলিয়ে বিশাল এই দলটি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে ২০শে নভেম্বর।

শিলিগুড়ি থেকে ফৌজী ট্রাকে গরুবাথান হয়ে পার্বত্য জনপদ লাভা। সেখান থেকে পাংকাসারি দুনং ব্লক। এখান থেকে শুরু হল 'ট্রেকিং' বা পদযাত্রা। এসে পৌঁছলেন তাঁরা 'রিচেলা চকে'। এবং সেখান থেকেই শুরু হয়েছে উৎরাই—আরম্ভ হয়েছে নিবিড় অরণ্যে ঢাকা নিয়োরা নদীর অববাহিকা, যেখানে সূর্যালোক ঢোকে না, কোনকালেও যেখানে পড়ে নি মানুষের পায়ের ছাপ। সেখানে কি আছে, কেউ তা জানে না।

সত্য কাহিনী যে গল্পের চেয়েও আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর হয়, এ অভিযান তারই বলিষ্ঠ প্রমাণ। তাই আসছে জানুয়ারি সংখ্যা থেকেই অজস্র দুর্লভ ফোটোতে সাজিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই অভিযানের চাঞ্চল্যকর ডায়েরী:

অজানা উপত্যকার গহনে

তিনজনের মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে ডায়েরীটি। তাঁরা হলেন দুঃসাহসিক মানুষ কিশোর চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার রাস্তোগী ও নিমাই পুরকাইত। শেষোক্ত দুজন কিশোর ভারতীর বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আপনজন। অনুলিখনে রয়েছেন ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর, কিশোর ভারতী ॥

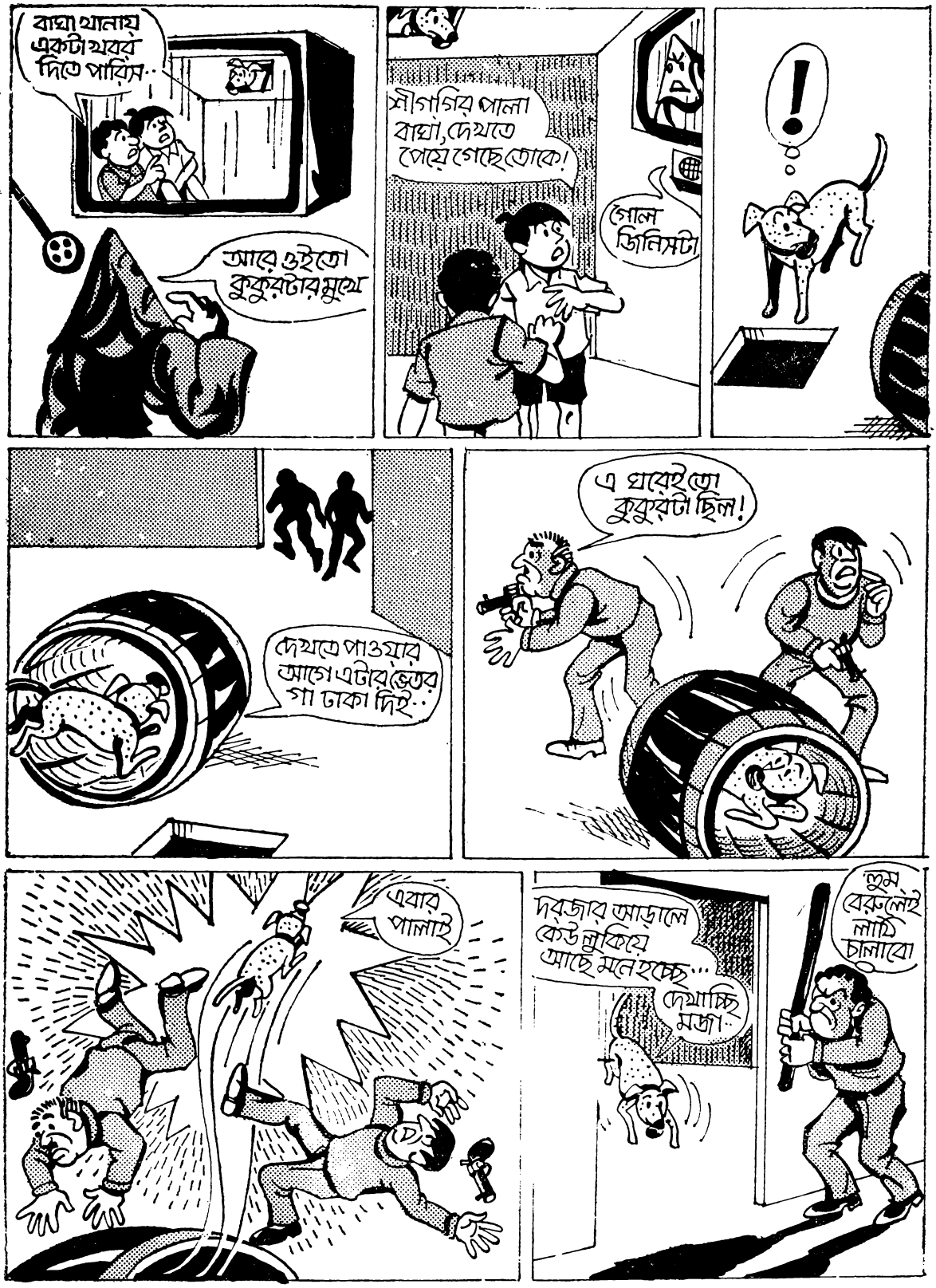

বাঘা থানায় একটা খবর দিতে পারিস...
আরে ওইতো কুকুরটার মুখে
শীগগির পালা বাঘা, দেখতে পেয়ে গেছে তোকে!
গেল জিনিসটা
!
দেখতে পাওয়ার আগে এটার ভেতর গা ঢাকা দিই...
এ ঘরেই তো কুকুরটা ছিল!
এবার পালাই
দরজার আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে মনে হচ্ছে...
দেখাচ্ছি মজা
তুম বেরুলেই লাঠি চালাবো

[গত সংখ্যার পর]

॥ এরপর আগামী সংখ্যায় ॥

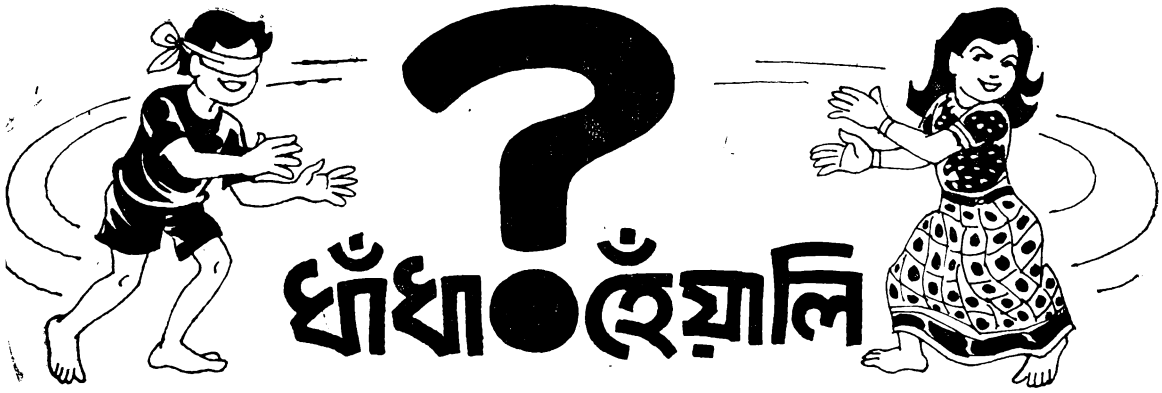

● গোরখনাথ ●

এবারের নানান খবরাখবরের ধাঁধাগুলি পাঠিয়েছেন শিবকৃষ্ণ, হাওড়া-২ থেকে। ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৩।

এক ॥ ঝক্কি আর ঝামেলা !

শ্রমিক অসন্তোষ। আর তার থেকেই হল নানান ঝামেলা। ওষুধের কোম্পানি প্রায় উঠে যায় আর কী ! শেষে অবস্থা সামাল দিতে ঠিক হয়, কোম্পানির বিভিন্ন দপ্তরগুলো এ, ওর জায়গায় ঠাঁই বদলাবে। কিন্তু এতেও কোম্পানির অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় না। তখন মোক্ষম দাওয়াই—ঠাঁই নড়ল বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান কর্তাদেরও।

কোম্পানির কারখানা ছিল বজবজে, বিক্রয়কেন্দ্র ডালহৌসিতে, রপ্তানিকেন্দ্র বাটানগরে ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজ হত দমদমে। ওই অফিসগুলির প্রধান কর্তা ছিলেন যথাক্রমে মিস্টার রায়, মিঃ পাল, মিঃ মুখার্জি ও মিঃ বোস।

দপ্তর ও সেই সঙ্গে তার প্রধান কর্তাদের ঠাঁই পরিবর্তনের পর এখন যা দাঁড়াল : বিক্রয়কেন্দ্র গেল বজবজে, মিঃ মুখার্জিকে পাঠান হল দমদমে.....। আরে ! সবই তো বলা হয়ে গেল। এবার বাকি খবরাখবর নিজেরাই তোমরা সংগ্রহ কর।

দুই ॥ জ্যামের জরিমানা

ইদানীং কলকাতা পুলিস খুব কাজ করছে। যান-বাহন নিয়মমাফিক পার্কিং না করার জের ধরে এক-দিনেই জরিমানা হয়েছে দেড়হাজার টাকা।—বড়বাজারে ঝাড়া তিনঘণ্টা জ্যামে আটকা পড়ে এই খবরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি : স্কুটার, মটরসাইকেল, লরি—সব যানই পড়েছে এই জরিমানার আওতায়। সাড়ে বারটাকা হচ্ছে প্রতি স্কুটার ও মটরসাইকেল পিছু জরিমানা, অন্যান্য গাড়ি পিছু কুড়ি টাকা ও লরির জরিমানার হার হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। দেড়হাজার টাকার মধ্যে মোটা অংশটাই এসেছে লরি বাবদ জরিমানা থেকে। তবে, সংখ্যার দিক থেকে গাড়ির সংখ্যা লরির থেকে দশটি বেশি। ব্যস এই পর্যন্তই খবর। এবার তোমরা বল জরিমানা করা মোট যানের সংখ্যা কত ?

তিন ॥ জাঁক করে আঁক কর

চারটে এককে পাশাপাশি বসিয়ে দুটো চিহ্ন ব্যবহার করলে ফলাফল দশ হবে। তবে, মনে রাখবে দুটো চিহ্নই যেন একরকম না হয়।

॥ অক্টোবর ধাঁধাঁ-হেঁয়ালির উত্তর ॥

এক ॥ বানভাসি
—আটাশ।

দুই ॥ বছর ঘুরে বয়স বাড়ে
—জন্ম দিন ৩১শে ডিসেম্বর। আর আজকের তারিখ ১লা জানুয়ারি।

তিন ॥ আপেলের বাটোয়ারা
—একজনকে ঝুড়ি সমেত আপেল।

ধাঁধা-হেঁয়ালি (অক্টোবর, ১৯৮২)-র উত্তরদাতাদের নাম

কৌশিক ভৌমিক বাগুর এভিনিউ কলকাতা-৫৫; সুজয় দাস কলকাতা-৪; অলোক সেন ফালাকাটা জলপাইগুড়ি অভিজিৎ, শুভজিৎ ও সুমি ব্রহ্ম চাঁচল মালদা; নির্মল, পরিমল, মিনতী ও মা পাথরঘাটা বর্ধমান; সুব্রত, জয়ন্ত ঘোষদস্তিদার ও টুয়া রায়চৌধুরি খড়দহ ২৪ পরগনা; প্রদীপকুমার কর, মা ও বাবা কলকাতা-৫৮; দেবোত্তম ও জয় রায় খড়গপুর; মদন ও মহুয়া বড়ুয়া শিলচর আসাম; শিউলি ও আখতার হোসেন ইছাপুর ২৪ পরগনা; গৌর ও সুলেখা সিংহ সাগরদীঘি মুর্শিদাবাদ; অজয় সাহা আগরতলা ত্রিপুরা; শিবু হারু, অমল, রেখা ও অনুপ ন হাওড়া-২; টিকলু, নতুন দা ও তপু মুখার্জি উত্তরপাড়া; দীপক দাশ লালবাগ; জীবন, তপন ও কজল সরকার মালদহ; পৃথা মৈত্র শিলিগুড়ি; অলয় সেনগুপ্ত কুচবিহার; দেবশ্রী ও অনুরাধা বিশ্বাস ধানবাদ; গাফ্‌ফার আলি নিউদিল্লি-১; প্রদ্যোৎ রায়, মুনমুন মণ্ডল কলকাতা—৪৫; ও আরো আরো অনেকে;

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়াড ঃ পর্যালোচনা

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেশের মান ও সম্মান কতোটা বাড়িয়ে দিতে পারে দিল্লির নবম এশীয় ক্রীড়া তার সব থেকে বড় প্রমাণ। এইমুহূর্তে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে

এশিয়াডের ক্রীড়াগ্রামের আনন্দ অনুষ্ঠান

ভারতের এই কৃতিত্বের কথা ছড়িয়ে রয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মত কট্টর ভারত বিরোধী কাগজ পর্যন্ত লিখেছে, এশিয়াড ভারতের সম্মান বাড়িয়েছে। এশিয়াড প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জয়। লণ্ডন, বার্লিনের কাগজে কাগজেও ভারতের প্রশংসা। অথচ এই কাগজগুলো এশিয়াডের খবর তেমন ছাপে নি। কিন্তু বড় বড় হরফে অকালিদের এশিয়াড বানচালের হুমকির কথা প্রকাশ করেছিল। আসলে ওরা চাইছিল একটা কিছু গণ্ডগোল হোক। তাহ'লে ওরাও চুটিয়ে লেখে। প্রস্তুতও হয়েছিল সেইজন্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না। উল্টে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন সকলে। তবে সব থেকে বড় সার্টিফিকেট এসেছে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি জুয়ান সামারাঞ্চ সাহেবের কাছ থেকে। এশিয়াডের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি হাজির ছিলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখেছেন অন্য ক্রীড়াকেন্দ্রগুলি। ক্রীড়াগ্রামে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন সব কিছু। দেখে তো তিনি দারুণ খুশি। বলেই দিলেন, এশিয়াডের এমন ব্যাপক আয়োজন করে ১৯৯২ সালের বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকের দায়িত্ব নেবার জোরালো দাবি রেখেছে ভারত।

চীনের কর্তারাও দারুণ খুশি। এশিয়াডে প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে দিল্লি প্রশংসা আদায় করে নিতে পেরেছে। জাপান শুধু এশিয়াড নয়, ওলিম্পিকেরও আয়োজন করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে পরবর্তী এশিয়াডের আসর বসবে। তার দু বছর পরেই সিওলে হবে বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিক। এই দুটি দেশও ভারতের কৃতিত্বের কথা জোর গলায় বলেছে। তারা বলেছে, এশীয় ক্রীড়ার সব থেকে বড় অনুষ্ঠান হল দিল্লিতে। এত দেশ, এত প্রতিযোগী আর কখনো এশিয়াডে অংশ গ্রহণ করে নি। প্রতিযোগিতার আয়োজন, সুষ্ঠু খেলাধূলা, থাকা-খাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর সুন্দর ব্যবস্থা সকলকে খুশি করেছে।

এশিয়ার সব দেশের কাগজে কাগজে বেরিয়েছেও সে কথা। এতে ভারতের মান-সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এশিয়াড আজ তাই আমাদের গর্ব।

এর জন্যে দরাজ হাতে খরচ করতে হয়েছে সরকারকে।

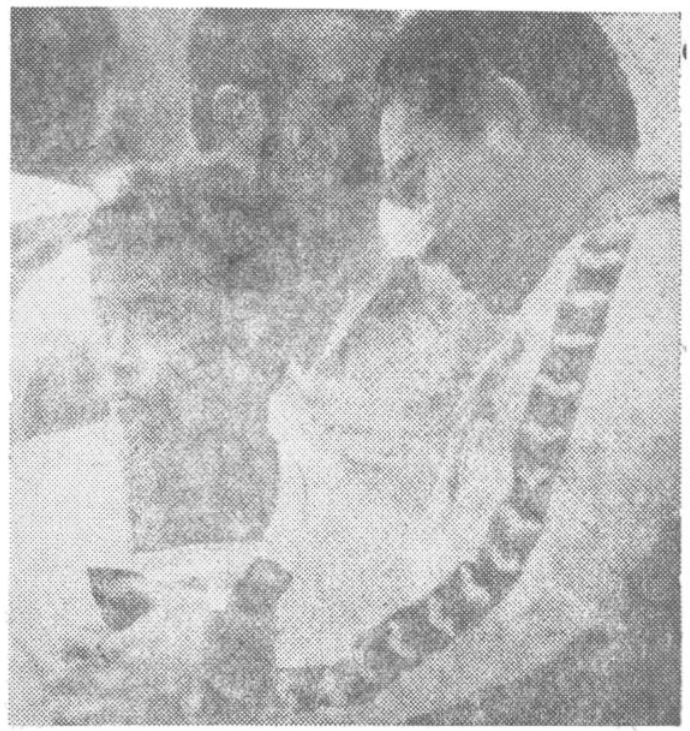

এশিয়াডের সব থেকে ছোট প্রতিযোগী আরবের সরাবী।

দিল্লির আগামী দশ বছরে যে উন্নতি হবার কথা ছিল তা গত দেড় বছরের মধ্যে করা হয়েছে। নতুন নতুন পথ, ঘাট, উড়াল পুল, বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, বৈদ্যুতিক চক্র রেল আরো কতো কি হয়েছে। এই কাজগুলো ভাগ করে নিজেদের বাজেট থেকে করেছে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, নিউদিল্লি মিউনিসিপাল করপোরেশন, আর রেলদপ্তর। সিরি ফোর্ট এলাকায় যে ক্রীড়া গ্রাম তৈরি হয়েছে তা থেকে লাভই হবে। ঐ বাড়ি আর ফ্ল্যাটগুলো এখন জনসাধারণের কাছে লটারি করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বছর দুয়েক আগেও যাঁরা সিরি ফোর্ট এলাকায় গেছেন তাঁরা এখন গেলে থ হয়ে যাবেন। তখন সেখানে ছিল ধু ধু মাঠ। গাছ-গাছড়া আর উঁচু নীচ পাথুরে জমি। এখন সেই জায়গাটার চোখ জুড়োন রূপ। সুন্দর সব বাড়ি, পথ, ঘাট। সিরি ফোর্ট এলাকা দিল্লির অভিজাত পল্লী হয়ে গেছে এখন।

সুতরাং ঐ সবের জন্যে যে টাকা খরচ হয়েছে তাকে এশিয়াডের খরচ হিসেবে ধরা ভুল হবে। তবে যে সব নতুন স্টেডিয়াম হয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই এশিয়াডের খরচ। তাও নেহাত কম নয়।

অনেকে বলছেন, ঐ টাকায় খাল কাটলে দেশের উপকার হতো। উপকার হতো যদি কারখানা, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ বানানো হতো। এ কথা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সত্য। সত্যিই তো যে দেশের অর্ধেক মানুষ দু বেলা পেট ভরে খেতে পায় না—সে দেশের পক্ষে এশিয়াডের মত খরচ বহুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা সাজে না।

ঠিকই তো! কিন্তু সেই সঙ্গে যাঁরা ঐ সব কথা বলছেন তাঁদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিতে ইচ্ছে করে—একটা, দুটো খাল কাটলে, কারখানা কিম্বা হাসপাতাল বানালে দেশের কতোটা উপকার হতো? ঐ একটি-দুটি খাল কি দেশের সব খরার জ্বালা জুড়িয়ে দিতো? না ঐ হাসপাতালে সব রোগীর যথার্থ চিকিৎসা হতো?

সত্যিই যদি এশিয়াডের জায়গায় ঐ সব কাজ হতো তাহ'লে আমরা কেউ তা হয়তো জানতেও পারতাম না। তার উপকার উপলব্ধি করা তো দূরের কথা। তার পাশে এশিয়াডের কথা চিন্তা করলে আমরা অন্য চিত্র দেখতে পাবো। আজ সারা বিশ্বে ভারতের প্রশস্তি। পাকিস্তানের সেফ দ্য মিশন বলেছেন, দিল্লি এশিয়াড এই মহাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

আরো একটা কথা আছে, এশিয়াডের সময় কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সব রাজ্যের সব মানুষ মেতে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিক ঐ প্রতিযোগিতা নিয়ে। সে কথা যে এতোটুকুও মিথ্যে নয় তার দূরদর্শনের সামনে ভিড় দেখলে কিংবা রেডিওয় সাধারণ মানুষের কান পাতা দেখলেই বোঝা যেতো। এশিয়াডের ষোল দিন সমস্ত ভারত হয়ে উঠেছিল 'এক জাতি এক প্রাণ'। আমাদের কাছে একি বড় কম পাওয়া।

এ সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে দিল্লির নবম এশীয় ক্রীড়া আমাদের উপকারই করেছে। আজ যে

ওয়াটার পোলোয় ভারত ব্রোঞ্জ পেয়েছে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের গোলকরার মুহূর্ত।

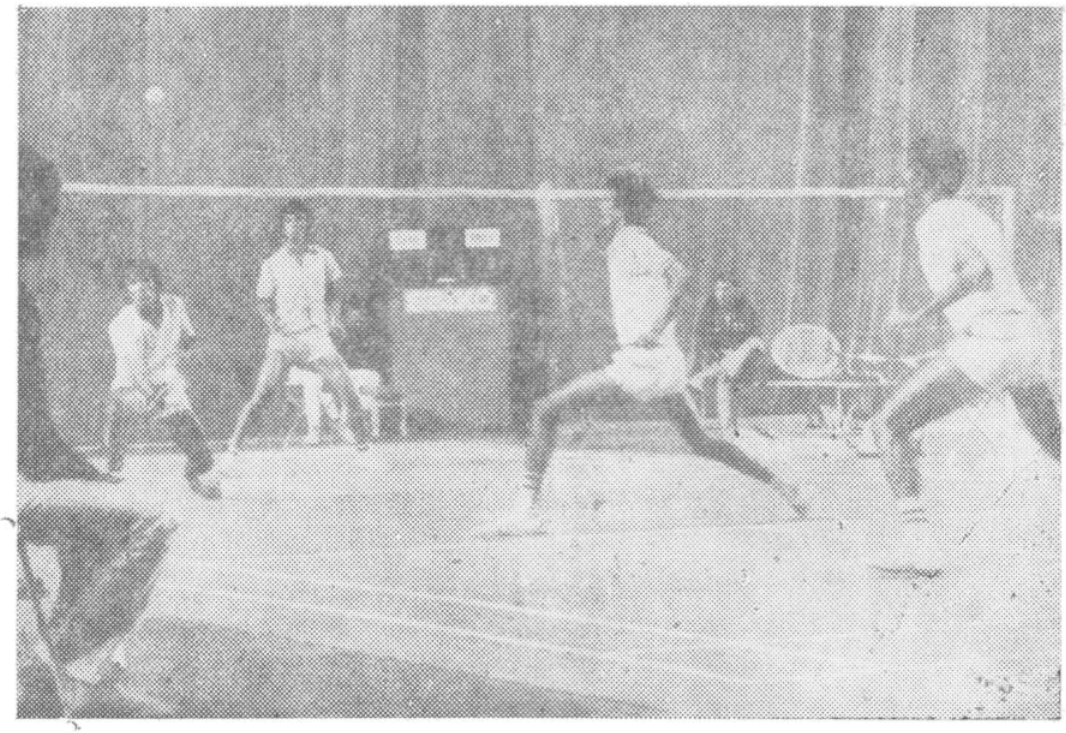

এশিয়াডের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত।

আমরা ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেট খেলা দূরদর্শনে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি এও তো এশিয়াডের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

তবে সাংগঠনিক দিক দিয়ে আমরা যতোটা এগোতে পেরেছি খেলাধূলার আসরে কিন্তু সে তুলনায় অগ্রগতি খুবই সামান্য। ফুটবল আর হকি আমাদের হতাশ করেছে। অ্যাথলেটিকস কিছুটা মান রেখেছে। সম্মান বাড়িয়েছে গলফ, অশ্বারোহণ আর পাল তোলা নৌকো চালনা। এশিয়াডে ভারতকে প্রথম সোনাটি এনে দিয়েছিলেন অশ্বারোহী রঘুবীর সিং ব্যক্তিগত বিভাগে। অশ্বারোহণের দলগত বিভাগেও সোনা জিতেছিল ভারত। গলফের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছিলেন কলকাতার ছেলে লক্ষ্মণ সিং। গলফের দলগত বিভাগের সোনাও এসেছিল ভারতের দখলে। দলগত বিভাবে খেলেছিলেন লক্ষ্মণ সিং, রাজীব মেটা আর ঋষি নারায়ণ। ঋষিও কলকাতার ছেলে। তা ছাড়া কুস্তিতে সতপাল সিং আর মুষ্টিযুদ্ধে সোনা জিতেছিলেন কৌর সিং। পালতোলা নৌ চালনায় সোনা জিতেছেন তারাপুরে আর করাঞ্জিয়া।

অ্যাথলেটিকসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন কেরলের মেয়ে বালসাম্মা। চার্লস বোরোমিও, চাঁদরায়, বাহাদুর সিংয়ের কৃতিত্বও কম নয়। বাংলার মেয়ে রীতা সেন চারশ মিটার দৌড়ে তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। কিন্তু ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে রুপো জয়ী দলের সদস্যা হিসেবে তিনি পেয়েছেন রুপোর পদক। গীতা জুৎসি আর পি. টি. উষা জিতেছে রুপো। অ্যাথলেটিকসে ভারত আরো ভাল করতে পারতো। পারেনি যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে। এ অভিযোগ আর কারো নয় উড়ন্ত শিখ স্বয়ং মিলখা সিংয়ের।

হকিতে মেয়েরা সোনা জিতলেও ছেলেরা ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে সাত গোল খেয়ে ভারতের মুখে চুন কালি মাখিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে দলটি দিল্লির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের কাছে সাত গোল খেল সেই দলটিই দশ দিনের মধ্যে কি করে মেলবোর্ণের এসাণ্ডা হকি প্রতিযোগিতায় পাক দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল! তবে এ কথা ঠিক যে ভারতীয় হকি দল সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে।

ফুটবলের ব্যাপারটাও তাই। আমরা অবশ্য আগেই লিখেছিলাম, ভারত টেনে টুনে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এগোতে পারবে। ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু যে দল চীনের সঙ্গে অমন খেলা খেলতে পারে সেই দল কী করে সৌদি আরবের কাছে শেষ মুহূর্তের গোলে হেরে

যায় ? অথচ এই ভারতীয় ফুটবল দলটিকে গড়ে পিঠে নেবার জন্যে সত্তর-আশি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।

যাই হোক আমরা যদি দিল্লি এশিয়াড থেকে ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলেই শুধু এত-টাকা খরচ করে এমন একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার আয়োজন করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

নিচে নবম এশিয়াডের চূড়ান্ত পদক তালিকা দেওয়া হল—

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চীন	৬১	৫১	৪১	১৫৩
জাপান	৫৭	৫২	৪৪	১৫৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৮	২৮	৩৭	৯৩
উত্তর কোরিয়া	১৭	১৯	২০	৫৬
ভারত	১৩	১৯	২৫	৫৭
ইন্দোনেশিয়া	৪	৪	৭	১৫
ইরাণ	৪	৪	৪	১২
পাকিস্তান	৩	৩	৫	১১
মঙ্গোলিয়া	৩	৩	১	৭
ফিলিপিনস	২	৩	৯	১৪
ইরাক	২	৩	৪	৯
থাইল্যাণ্ড	১	৫	৪	১০
কুয়েত	১	৩	৩	৭
মালয়েশিয়া	১	০	৩	৪
সিঙ্গাপুর	১	০	২	৩
সিরিয়া	১	১	১	৩
লেবানন	০	১	০	১
আফগানিস্তান	০	১	০	১
হং কং	০	০	১	১
ভিয়েতনাম	০	০	১	১
বাহেরিন	০	০	১	১
কাতার	০	০	১	১
সৌদি আরাবিয়া	০	০	১	১
মোট	১৯৯	২০০	২১৫	৬১৪

জিমনাস্টিকে ৩টি সোনা ও ৩টি রুপো এবং সাঁতারে একটি রুপোর পদক অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। ব্যাড-মিন্টন, মুষ্টিযুদ্ধ আর টেবল টেনিসে সেমিফাইনালে পরাজিতদেরও ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়েছে।

নেহরু স্টেডিয়ামে ছেলেদের ৪X৪০০ মিটার রিলে দৌড়।

মুখ তোড় জবাব

হিন্দীতে একটা কথা আছে—'মুখ তোড় জবাব'। বাংলায় আমরা বলতে পারি, জবাবের মত জবাব বা মুখের ওপর জবাব। সেই যাই হোক না কেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তাদের মুখের ওপর এতোদিনে সত্যিকারের জবাবের মত জবাব দিয়েছেন মহিন্দর অমরনাথ।

ক্রিকেট রাজনীতির শিকার হয়ে মহিন্দরকে গত তিন বছর টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয়েছিলো। বারবার যোগ্যতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও তাঁকে এড়িয়ে যেতেন নির্বাচকরা। শুধু তাই নয়, খেলোয়াড় জীবনের সব থেকে বড় শত্রু হলো বদনাম বা অপবাদ। মহিন্দরের ওপর সেই অপবাদের বোঝাও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

বলা হয়েছিল মহিন্দর অমরনাথ ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ঠিক মত খেলতে পারেন না। যে খেলোয়াড়টি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে সে দেশের দুর্ধর্ষ সব ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে ব্যাট করে এলেন দেদার রান করলেন, সেঞ্চুরি হাঁকালেন—সেই খেলোয়াড়টিই ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে গিয়ে তেমন সুবিধে করতে না পারার জন্যে অপবাদের লক্ষ্য হলেন। আসলে মহিন্দরের সাফল্য ক'য়েকজনের চক্ষুশূল হয়েছিলো। তাই তাঁকে দল থেকে বাদ দেবার চক্রান্তরই পরিণতি ঐ বদনাম।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্যি সত্যিই ঐ সব চক্রান্তকারীদের জয় হল। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাঝের সারির ব্যাটসম্যান মহিন্দর অমরনাথ। মহিন্দর একা নন—অমন অবিচার ভারতীয় ক্রিকেট অনেক খেলোয়াড়ের ওপরই করেছে। কাউকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে। কেউ আবার টেস্ট খেলারই সুযোগ পান নি। বাংলার দুই খেলোয়াড় ব্যাটসম্যান গোপাল বসু আর মিডিয়াম পেস বোলার ডি. এস. মুখার্জির নাম এই ব্যাপারে মনে পড়বেই। ডি. এস. মুখার্জি সম্বন্ধে সব থেকে বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন স্যার গ্যারি সোবার্স। ভারত সফর শেষ করার পর তিনি বলেছিলেন, ভারতে একটি বোলারের বিরুদ্ধে খেলতেই তিনি অসুবিধা বোধ করেছেন—অথচ সেই খেলোয়াড়টিকে টেস্টে খেলানো হয় নি। তাঁর নাম ডি. এস. মুখার্জি।

ডি. এস. কিম্বা গোপাল বসুদের মতো অজস্র বঞ্চিত খেলোয়াড় সারা ভারতে আছেন। আবার শুরু নায়েক, গোলাম পারকাররাও আছেন। যাঁরা অযাচিতভাবে শুধু ব্যাকিংয়ের জোরেই টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে গেছেন। তাঁরা যে ধোপে টেকেন না—সে তো জানা কথাই। কিন্তু যাঁরা বঞ্চিত হলেন তাঁদের পক্ষেও দলে ফেরা যে কতো কষ্টের তা মহিন্দর অমরনাথের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

মহিন্দরের মতো মদনলালও হঠাৎ দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু গতবছর তাঁকে বাধ্য হয়েই দলে ডেকে আনতে হয়েছিলো। কিন্তু মহিন্দরের কথা ভুলেও ভাবেন নি নির্বাচকরা। অথচ মহিন্দর রনজি ট্রফি, দলীপ আর ইরানী ট্রফিতে সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করেছেন। ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন—সব দিক দিয়ে নিজের যোগ্যতা বারবার প্রমাণ করেছেন—তবু তিনি অবহেলিতই রয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ অবিচারে সাধারণ ক্রিকেট অনুরাগীদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিগত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলগড়ার পর প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে। তারই জের টেনে এবার নির্বাচক মণ্ডলী ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলও ফলেছে হাতে হাতে। দলে ফিরে এসেছেন মহিন্দর অমরনাথ। আর ফিরেই পাকিস্তান সফরে গিয়ে প্রথম টেস্টে ভারতের অতিবড় প্রয়োজনের মুহূর্তে সেঞ্চুরি করে ভারতীয়বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল ওপর জবাবের মতো জবাব দিয়েছেন। একেই বোধহয় বলে 'মুখ তোড় জবাব'।

যোগ্য জবাব

লাহোরের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পাকিস্তান যখন প্রথম দুটি দিনের পুরো সময় ব্যাট ধরে পড়েছিলো তখনই বোঝা গিয়েছিলো কোন ঝুঁকি ওরা নিতে চায় না। এ কথাও ইমরাণ আর তাঁর সহ খেলোয়াড়রা ভালভাবেই জানতেন যে বাকি তিন দিনে ভারতকে দু দুবার আউট করা সম্ভব নয়। ভারতীয় দলের এগারো জনের মধ্যে দশজনই ব্যাট করতে পারেন। দু চারটি উইকেট তাড়াতাড়ি হারালেও ফলো অন এড়ানোর মতো সামর্থ্য তাই ভারতীয় দলের আছে। ইমরাণ চেয়েছিলেন, অঘটনের সুযোগ নিতে। হঠাৎ যদি ভারতীয় দলে ধ্বস নামে তাহ'লে তিনি তাঁর দলকে জয়ের পথ দেখাবেন।

তা ইমরাণের ইচ্ছে একসময় পূর্ণ হতে চলেছিল। অরুণলাল, বেঙ্গ সরকার ও বিশ্বনাথের উইকেট পরপর হারিয়ে ভারত রীতিমত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো। তিনটি উইকেটই দখল করে পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরাণ খান তখন দুরন্ত দুর্ধর্ষ। সেই মুহূর্তে ভয়ংকর ইমরাণ, সরফরাজ, তাহির নাকাশের সামনে বুক ফুলিয়ে গাভাসকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মহিন্দর অমরনাথ। আর তিনি পেছন ফিরে তাকান নি। ৩৭৯ রানে যখন ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল তখনো অপরাজিত মহিন্দর। তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছিলো ১০৯ রাণের একটি সংগ্রামী ইনিংসের স্মৃতি।

সুনীল গাভাসকার ৮৩ রান করে আউট হয়ে যান। একটি বাইরের বলে তিনি তোল্লা ক্যাচ তুলে দেন। মাত্র ১৭ রানের জন্যে তিনি পারলেন না টেস্ট ক্রিকেটে স্যার গ্যারি সোবার্সের ২৬টি সেঞ্চুরির নজির ছুঁতে। ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করায় তাঁর শতরানের সংখ্যা এখন ২২। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এখন ২-০ টেস্টে এগিয়ে আছে।

ওকথা থাক। ভারত-পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ম্যাচের কথায় আসা যাক। টেস্ট খেলার ক দিন আগে থেকে লাহোরে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাই খেলার দিন পিচ ছিলো স্যাঁতসেতে। পরিবেশ মেঘলা। তাই টসে জিতে গাভাসকার পাকিস্তানকেই ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাচ ফেলে ভারতীয়রা হারিয়েছিলো ম্যাচ মুঠোয় আনার সুযোগ। প্রথম আর দ্বিতীয় দিন গোটা ছয়েক ক্যাচ তালুবন্দী করতে পারলে খেলার চেহারা বদলে যেতো। জাহির আবাস ডাবল সেঞ্চুরি তো দূরের কথা সেঞ্চুরিও করতে পারতেন না।

যাই হোক—লাহোরের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি ভারতের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকারের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই টেস্টেই তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে সাত হাজার রানের গণ্ডী ডিঙিয়ে যান। গাভাসকারের আগে টেস্টে সাত হাজারের বেশি রান করেছেন ইংলণ্ডের জিওফ বয়কট, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্যার গ্যারি সোবার্স আর ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে ও ওয়ালি হ্যামণ্ড।

নীচে সাত হাজারী ক্লাবের পাঁচ সদস্যের সম্পূর্ণ খতিয়ান দেওয়া হলো—

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	সেঞ্চুরি
বয়কট	১০৮	১৯২	২২	৮০৮০	২৪৬	২১
সোবার্স	৯৩	১৬০	২১	৮০৩২	৩৬৫	২৬
কাউড্রে	১১৪	১৮৫	১৫	৭৬২৪	১৮২	২২
হ্যামণ্ড	৮৫	১৪০	১৬	৭২৪৯	৩৩৬	২২
গাভাসকার	৮০	১৪০	১০	৭০৩৪	২২১	২৫

(পাকিস্তানে প্রথম টেস্ট পর্যন্ত)

ভারত-পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর—

পাকিস্তান ঃ প্রথম ইনিংস—৪৮৫ (জাহির আব্বাস ২১৫, মহসিন খান ৯৪, দিলীপ দোশি ৯১ রানে ৫, মদনলাল ১০১ রানে ৩, কপিলদেব ১৪৯ রানে ২)

ভারত ঃ প্রথম ইনিংস—৩৭৯ (মহিন্দর অমরনাথ অপরাজিত ১০৯, গাভাসকার ৮৩, অরুণলাল ৫১, সন্দীপ পাতিল ৬৮; ইমরাণ খান ৬৮ রানে ৩, সরফরাজ নওয়াজ ৬৩ রানে ৪, জালালউদ্দিন ৯৩ রানে ২)

পাকিস্তান ঃ দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইঃ ১৩৫ (মহসিন খান ১০১ নঃ আঃ)

এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পাকিস্তান থেকে ফিরতে না ফিরতেই ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পথে পাড়ি দেবে। আর সেই সফর চলবে মে মাসের গোড়া পর্যন্ত। সেখানেও শেষ নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের পরই ইংলণ্ডে শুরু হবে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ আগামী ক'য়েকমাস খেলোয়াড়দের আর বিশ্রাম নেই।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর শুরু

হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন কিংসটনে জামাইকার সঙ্গে চার দিনের খেলাটি শুরু হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দল পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ ছাড়া তিনটি এক দিনের আন্তর্জাতিক খেলা আর ছটি চার দিনের খেলায় অংশ নেবে। ভারতীয় দল ১৪ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পেঁাছুবে।

নীচে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরের সূচী দেওয়া হলো :

১৭-২০ ফেব্রুয়ারি : কিংসটনে : জামাইকার সঙ্গে খেলা।
২৩-২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম টেস্ট : কিংসটন

(বিরতি ২৫ ফেব্রুয়ারি)

৩-৬ মার্চ : পোর্ট অফ স্পেনে : ত্রিনিদাদে টোবাগোর সঙ্গে খেলা।
৮ মার্চ : পোর্ট অফ স্পেনে একদিনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ।
১১-১৬ মার্চ : দ্বিতীয় টেস্ট : পোর্ট অফ স্পেন

(বিরতি ১৪ মার্চ)

১৮-২১ মার্চ : গ্রেনাদায় উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে
২৪-২৭ মার্চ : জর্জটাউনে গায়নার সঙ্গে খেলা
২৯ মার্চ : গায়নায় একদিনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ
৩১মার্চ-৫এপ্রিল : তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ : গায়নায়

(বিরতি ১ এপ্রিল)

৭ এপ্রিল : গ্রেনাডায় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ
৯-১২ এপ্রিল : ব্রিজটাউনে বার্বাডোজের সঙ্গে খেলা
১৫-২০ এপ্রিল : চতুর্থ টেস্ট : ব্রিজটাউন

(বিরতি ১৮ এপ্রিল)

২২-২৫ এপ্রিল : কিটসে লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে খেলা।
২৮ এপ্রিল-৩ মে : পঞ্চম টেস্ট : সেন্ট জনস

(বিরতি ২৯ এপ্রিল)

আবার জাতীয় ফুটবল

কলকাতায় এবার টেস্ট ম্যাচ নেই। নেই বড় সড় ক্রিকেট খেলাও। কিন্তু শেষ শীতে সে দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে ফুটবল। ক'বছর পরে কলকাতায় আবার জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির খেলা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে মোহনবাগান মাঠে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। তারপর প্রায় পুরো মাসটাই ফুটবল নিয়ে মেতে থাকবে বাংলা।

কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। আজ থেকে একশ বছরেরও আগে এই কলকাতা শহরেই প্রথম ফুটবলের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিলো। ভারতের প্রথম ফুটবল ম্যাচটি অবশ্য সাহেবরাই খেলেছিলেন। সিভিলিয়ানস দলের সঙ্গে খেলেছিলো জেন্টলমেন অফ ব্যারাকপুর। তারপর গোরা আর সাহেবদের আঙিনা পার হয়ে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর হাতধরে ফুটবল একদিন ঢুকে পড়েছিলো বাঙ্গালীপাড়ায়। তারপর আর বেশিদিন লাগে নি। শোভাবাজার, ন্যাশানাল, কুমারটুলি ক্লাব এলো ফুটবল খেলতে। তারপর এলো মোহনবাগান, এরিয়ান্স, মহামেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গলের আগমন আরো অনেক পরে।

তবে ফুটবল বলতে তখন কলকাতাকেই সকলে বুঝতেন। আই. এফ. এ. শীল্ড তারপর কলকাতার ফুটবল লীগ তারও পরে এলো ডুরাণ্ড কাপ আর রোভার্স কাপ। ততোদিনে ফুটবল ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের সর্বত্র। তবু কলকাতাই রইলো ফুটবলের পীঠস্থান। আজো ফুটবলের শহর বলতে লোকে কলকাতাকেই বোঝে। ভারতীয় দলের দিকে তাকালে তার যৌক্তিকতারও প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই বাংলার। তাই বাংলাই আজো ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। হাজার চেষ্টা করেও অন্য রাজ্যগুলি পারে নি বাংলার আধিপত্য খর্ব করতে। প্রতি বছরই অন্য রাজ্যগুলো সেই চেষ্টা করে। এবারও করবে। সেই লক্ষ্য নিয়ে তারা এবার আবার কলকাতায় খেলতে আসবে।

পাঞ্জাব, গোয়া, মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্ণাটক দলের আপ্রাণ চেষ্টা হবে বাংলাকে হারানো। আর তাই নিয়ে ফুটবলের কলকাতা আবার মেতে উঠবে। আসছে জাতীয় ফুটবল—তারই প্রস্তুতি এখন সব দিকে।

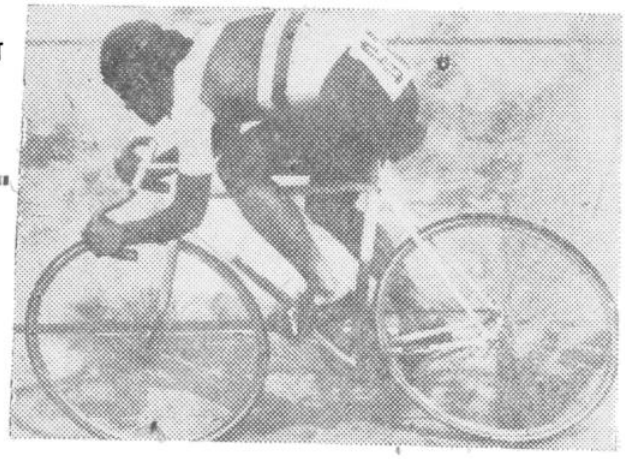

যমুনা ভেলো ড্রোমে সাইক্লিংয়ের আসরে।

——সাম্প্রতিক কিশোর ভারতী ও তার মূল্যবৃদ্ধি ঃ পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে——

শংকর ভট্টাচার্য, কলকাতা ৭০০ ০০৮ থেকে লিখছেন ঃ

আপনারা পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধির যে চিন্তা করছেন, তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য, এই পত্রিকার আকার-আয়তন-ছাপা, তদুপরি এর লেখার উন্নত মান পত্রিকাটির আভিজাত্য প্রকাশ করে। আমি মনে করি, শুধুমাত্র ২ টাকার বিনিময়ে এরকম পত্রিকা পাওয়া বা যা এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল, তা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

এ বিষয়ে আমার একটা কথা বলার আছে। আপনারা দাম ৩ টাকা করবার যে প্রস্তাব করেছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু সর্বস্তরের ক্রয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করে, সকলের কাছে পত্রিকা পেঁাছে দেবার সংকল্প মনে রেখে, আমার নিবেদন, এর দাম ২ টাকা ৫০ প. করুন। এর ফলে হয়তঃ আপনাদের লোকসান সর্বতো-ভাবে মিটবে না, তবু মন্দের ভাল হিসেবে এই ২ টাকা ৫০ প. দাম নির্ধারণ করতে অনুরোধ করি। পত্রিকাটির সর্বাংগীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কেশব পাল, ইসলামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে লিখছে ঃ

আপনি সম্পাদকীয়তে কিশোর ভারতীর যে লোকসানের কথা লিখেছেন, তাতে শুধু আমি নই, নিশ্চয়ই প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই দুঃখিত হয়েছেন।

আপনি ঠিকই বলেছেন, বাজারের সব কিছুরই দাম বেড়েছে, পত্রপত্রিকা সম্পর্কে আপনি যে অভি-যোগ করেছেন, তাও সঠিক। আমি এখন কি করেছি জানেন? খবরটাকে ঠিক রাখবার জন্য আগে যে ছোটদের পত্রিকাগুলি রাখতাম, সেগুলির অনেককেই বাদ দিয়েছি। শুধু রয়ে গেছে কিশোর ভারতীসহ আর কিছু বই, যেগুলো ভালোও লাগে, দামেও কম।

তবে কিশোর ভারতীর সমস্যাটা সম্পর্কে আমার প্রস্তাব হল, এর দাম শতকরা পঞ্চাশ ভাগ না বাড়িয়ে শতকরা ত্রিশ ভাগ বাড়ানো হোক্, অর্থাৎ পুরো তিনটাকা না করে ২ টাকা ৫০ প. রাখা হোক্।

এইসঙ্গে আমি আবেদন জানাই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও কিশোর ভারতীর পাঠকপাঠিকাদের, তারা যেন বিজ্ঞাপন দিয়ে কিশোর ভারতীকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন।

রবিশংকর সুর, কলকাতা-৩৪ থেকে লিখেছে ঃ

কিশোর ভারতীর দাম বাড়াবার প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে পারি, দাম বাড়লে আমাদের কষ্ট হয়। এবং পত্রিকা রাখা তখন দুস্কর হয়ে পড়ে। আগে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হয়, তারপর পত্রিকা। তবুও মাগগীগণ্ডার বাজারে পত্রিকার জন্যে বড়জোর দশ/কুড়ি পয়সা বেশি দেওয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। যারা ৫০% বা ১০০% দাম বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি সে দলের নই। আপনারা যদি ব্যাপক চিন্তা করেন, আমার মতো ক্রেতাই সবচেয়ে বেশী।

অলোক সেন, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি থেকে লিখছে ঃ

আমি কিশোর ভারতীর একজন পাঠক। পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হিসেবে যে কিশোর ভারতীটি বের হয়েছে, তার অঙ্গসজ্জা, বিষয়বৈচিত্র্য সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু তার দাম বাড়ে নি বা আকার কিংবা পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে নি। দেখতে পাচ্ছি তার অঙ্গসজ্জা, বিষয়বস্তুর ক্রমোন্নতি ঘটছে। সেদিক থেকে কিশোর ভারতীর দাম বাড়ানো উচিৎ। গত এক/দেড় বছরে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য পত্রিকার দাম যেখানে বিরাট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিশোর ভারতীই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর মাসিক, যার দাম এখনও বাড়েনি।

তাই আপনারা আমাদের ক্রয়ক্ষমতার কথা মনে রেখে তার দাম ৩.০০ টাকা করতে পারেন। তবে আমার অনুরোধ, কিশোর ভারতীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২-কে বাড়িয়ে ৮০ পৃষ্ঠা করুন।

রথীন্দ্রনাথ রায়, শিলিগুড়ি-১ থেকে লিখছেন ঃ

কিশোর ভারতীর অক্টোবর সংখ্যার আপ্পুর ছবিসহ প্রচ্ছদ সত্যিই অনেকদূর থেকে চোখ কেড়ে নেয়। কিশোর ভারতীর দাম ২/৫০ প. করা যেতে পারে। করুণ ৩ টাকা করা হলে তা অনেকের ক্রয়-ক্ষমতার উর্ধে চলে যেতে পারে। অথবা একটা নতুন কাজ করা যেতে পারে। কাগজটিকে পাক্ষিক করে ৪০ পাতার দুটি সংখ্যা মাসে বের করা হলে মন্দ হবে না। প্রতি সংখ্যার দাম হবে ১/৫০ প. বা ২ টাকা। অবশ্য প্রস্তাবটা কিশোর ভারতীর সমস্ত

পাঠকবৃন্দের সমীপে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কিশোর ভারতী একটু চেষ্টা করলেই তার জয় অনিবার্য।

জীবিতেশ রায়, দয়াপুর, চব্বিশ পরগণা থেকে লিখছে ঃ

আমি কিশোর ভারতীর এক নিয়মিত পাঠক। সত্যি, কী সুন্দর কিশোর ভারতী; আমার মনের ক্ষুধার সে সবটাই পূরণ করে চলেছে। কামনা করি, কিশোর ভারতী শতায়ু হোক, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক তার।

কিশোর ভারতীর দাম নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি হওয়া উচিৎ। এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে এরকম সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার দাম ২·০০ টাকা থাকা অসম্ভব। আপনারা যে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন, এতেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। কারণ, দাম বাড়াবার সময় কোন পত্রিকাই তো তার পাঠকদের মতামত চায় না! কিশোর ভারতী একান্তভাবে যে আমাদের, তাই এমনটা হয়েছে।

আমাদের চারিধারে আজ খরায় কবলিত। আমাদের গ্রামও তার মধ্যে। তাই আমার মনে হয়, কিশোর ভারতীর দাম শতকরা ২৫% বৃদ্ধি হওয়া ভাল। অর্থাৎ ২·৫০ টাকা। তাহলে সব পাঠক-পাঠিকাবন্ধুই তাকে আবার নতুন উদ্যমে গ্রহণ করতে পারবে। না হলে হয়ত কিছু বন্ধুকে হারাতে হবে। কিশোর ভারতীর সকলকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

অমিত কুমার দে, দিনহাটা কুচবিহার থেকে লিখেছে ঃ

অক্টোবর সংখ্যার 'আমাদের কথা' পড়ে আপনাদের অসুবিধে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। কিশোর ভারতী তো আমাদের একান্ত বন্ধু। অতএব তার এই সংকট মুহূর্তে তো আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাই কিশোর ভারতীর মূল্য কিছুটা বাড়ান। দু টাকা থেকে দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা করলেই কি ঠিক হবে না? কেননা, কিশোর ভারতীর এমন অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা আছেন, যাঁরা তিন টাকা দিয়ে কিনতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁরা তাকে ছেড়ে থাকতেও পারবেন না। সুতরাং তাদের সকলের কথা চিন্তা করে কিশোর ভারতীর দাম ২·৫০ টাকা করলে ভালো হয়। বিষয়টি ভেবে দেখলে আনন্দিত হবো।

সৌম্যকান্তি ভট্টাচার্য, কাছাড়, আসাম থেকে লিখছে ঃ

অক্টোবর সংখ্যা কিশোর ভারতীর 'আমাদের কথা' পড়ে জানতে পারলাম কিশোর ভারতীর সাধারণ সংখ্যার মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে আপনারা আমাদের মতামত চান। এতে আমি এতো খুশি হয়েছি যে, আপনাদের কোন্ ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না। সত্যই আজ আবার নতুনভাবে বুঝলাম কিশোর ভারতী আমাদেরই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু সেইসঙ্গে এই ভেবে অভিমান হচ্ছে, যে শুভার্থী একান্ত আপন বন্ধুদের দৌলতে কিশোর ভারতীকে পাচ্ছি এমন রূপে, তারাই কিনা আমাদের উপরে নিজেদের আস্থা ও বিশ্বাস হারালেন!

আমার একান্ত ইচ্ছা, আমাদের এই সুখদুঃখের প্রিয়তম বন্ধুটির দুঃখের দিনে আমরা যদি তার দুঃখের ভার কিছুটাও বহন করতে পারি সবাই মিলে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো। কিশোর ভারতী যা দিচ্ছে তার পরিবর্তে আমাদের যা দিতে হয়, তা অতি নগণ্য, কিছুই না। অথচ এই দেওয়ার উপরেই নির্ভর করছে তার সুস্থ সবল জীবন। কাজেই যে অধিকারে আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি, সেই অধিকারেই কি তার দুর্দিনের সমভাগী হতে পারি না?

ক্ষুদ্র একটা কথা বলতে গিয়ে বাচালতা করে ফেলেছি বলে মাপ করবেন। কিশোর ভারতীর প্রতি আমার বুক উজাড় করা প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আপনাদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর, টাটা থেকে লিখছে ঃ

কিশোর ভারতী খুলেই পড়ি 'আমাদের কথা'। অক্টোবর সংখ্যা পড়েই চমকে উঠলাম। সত্যিই তো! এদিকটা তো ভাবি নি। কি স্বার্থপর আমরা। যেখানে সব পত্রপত্রিকার দাম গত দু-এক বছরে হু-হু করে বেড়েছে, সেখানে একই মূল্যে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে আমাদের কাছে পেঁছানোর জন্য কিশোর ভারতী নিঃশব্দে কি লোকসানই না দিচ্ছে!

না-না, এ ক্ষতি চলতে পারে না। অবিলম্বে দাম বাড়ান কিশোর ভারতীর, যাতে সে সুস্থ দেহে আরও বহু-বহুদিন আমাদের বুকের ভিতর রইতে পারে! তবে একটা কথা। ৩.০০ টাকা দিতে অনেকেরই কষ্ট হবে। সম্ভব হলে ২·৫০ টাকা করুন। সবার মুখ চেয়ে আমার এই অন্যায় আবদার।

শান্তনু গুপ্ত, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে লিখছে ঃ

আমি কিশোর ভারতীর এক বন্ধু। যদিও বেশিদিন এর সঙ্গে পরিচিত হই নি, তবুও সে আমাকে অভিভূত করেছে। গত অক্টোবর সংখ্যায় তার ক্ষতির কথা কিছু পড়েছি। এ বিষয়ে আমার কিছু অনুরোধ আছে।

প্রথমতঃ কিশোর ভারতীর কাগজ যথাসম্ভব কমদামী দেওয়া যায়। তারপর ছবিতে কবিতার বদলে শুধু কবিতা ছাপলে জায়গা কম লাগে, খরচও কম। গল্পেও যথাসম্ভব কম ছবি দেওয়া চলে। কারণ কিশোর ভারতী তো শিশু-পত্রিকা নয়! তবে খেলাধুলা বিভাগে

ছবি দরকার। এছাড়া পত্র ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের নাম ও বিবরণ আলাদা পাতায় প্রকাশ না করে 'বইয়ের দুনিয়া' বিভাগে প্রকাশ করা যায়।

সবশেষে বলি, দামের কথা। আমার মনে হয়, একবারে ৩·০০ টাকা না করে ২·৫০ টাকা বা ২·৭৫ টাকা রাখা যেতে পারে।

আমাদের সিদ্ধান্ত

প্রিয় বন্ধুগণ,

কিশোর ভারতীর ক্রমবর্ধমান নিদারুণ লোকসান ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে গত অক্টোবর ১৯৮২ সংখ্যায় সম্পাদক বন্ধু সম্পাদকীয়তে তোমাদের মতামত আহ্বান করেছিলেন। তারপর থেকে শুরু হল এক আশ্চর্য ঘটনা, পত্রপত্রিকার জগতে বিরলও বটে। প্রতিদিন অজস্র চিঠি এসেছে আমাদের দপ্তরে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য সবুজপ্রাণ বন্ধুর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভরা মাধুর্যমণ্ডিত চিঠি আর চিঠি। সব চিঠিরই মূল সুর কিন্তু একই, এই লোকসানের চাপে কিশোর ভারতীর যেন কোন ক্ষতি না হয়, যেন ব্যাহত না হয় তার অপ্রতিহত জয়যাত্রা।

প্রথমে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পরক্ষণেই মনে হল, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! তোমাদের অন্তরের এই উত্তাপভরা ভালবাসা ও শুভকামনাই তো তার সবচেয়ে বড় পাথেয়, বড় সম্বল।

এখনও বন্ধু, বহু বহু চিঠি জমা হয়ে আছে আমাদের দপ্তরে, স্থানাভাবের দরুণ যাদেরকে প্রকাশ করা গেল না। সেইসব বন্ধুদের প্রতি আমরা গভীর দুঃখপ্রকাশ করছি।

তোমাদের সকলের চিঠি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগ বন্ধুরই অভিমত, কিশোর ভারতীর দাম একবারে বেড়ে যেন **তিন টাকা** না হয়। তাতে চরম মূল্যবৃদ্ধির এই দিনে তোমাদের অভিভাবকদের কষ্টের বোঝা আরও ভারি হয়ে উঠবে।

তাই আমরা ঠিক করেছি, না একেবারে তিন টাকা নয়। কিশোর ভারতীর দাম আপাততঃ বাড়ছে মাত্র ৫০ পয়সা, অর্থাৎ মোট ২·৫০ টাকা। অতীতের মত কিশোর ভারতী ভবিষ্যতেও না হয় তোমাদের মত প্রিয়তম আপনজনদের কথা ভেবে কষ্টস্বীকার করে নেবে।

সুতরাং মাভৈ! রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে অতুলনীয় সাজে সেজে আগামী জানুয়ারি সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই হাজির হচ্ছে। তাতে থাকছে সম্পাদক বন্ধু, মহাশ্বেতা দেবীর দুটি অসাধারণ রচনা। থাকছে অজানা উপত্যকায় অভিযানের চাঞ্চল্যকর রোজনামচা। এছাড়া অন্য সব কিছু তো আছেই।

পরিশেষে, তোমাদের সকলকে জানাই বুকভরা ভালবাসা ও উষ্ণ অভিনন্দন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

তোমাদের **কর্মাধ্যক্ষ বন্ধু**

বাণী মৌলিক

হিমাদ্রিশেখর পাত্র, লেক টাউন, 'এ' ব্লক, কলিকাত-৮৯

—শ্রদ্ধেয়া বাণীদি, সবার প্রথমে আমার ও আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক প্রণাম ও অভিনন্দন। আপনার এই 'সওয়াল জবাব' বিভাগটি আমাদের পরিবারের বিশেষ করে আমার খুবই প্রিয়। আপনার রসিকতাপূর্ণ, ভাবগম্ভীর উত্তর আপনার জ্ঞান ও রসিক মনেরই পরিচয় দেয়। আমি কিশোর ভারতীর নিয়মিত গ্রাহক। গত এপ্রিল মাসের কিশোর ভারতীতে (১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) আপনার বিভাগে একটা উত্তর দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগায় এই পত্রের অবতারণা। O. K.-র পুরো শব্দটা কি, তার উত্তরে আপনি লিখেছেন, 'Okay' এটা আমেরিক্যান ইংরেজী, অশিক্ষিত-জনদের কথ্য ভাষা থেকে গৃহীত।' কিন্তু আমি..... (অন্য একটা বই)-তে দেখেছিলাম, O. K. কথাটা 'All Correct' (slang term)-এর abbreviation। আমার প্রশ্ন ঃ এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? আপনি এ সম্বন্ধে সঠিক বিস্তৃত তথ্যটি জানালে খুশী হব।

ঃ জবর মুশকিল, বুঝলে? বাজার-চলতি কোন বই দেখে তোমাদের মনে যদি এভাবে সংশয় জাগতে থাকে আর তা নিরসনের দায় যদি চাপে আমার ঘাড়ে, তাহলেই হয়েছে আর কি। তাহলে 'রাঁচী' বা 'লুম্বিনী' মুখো বাণী মৌলিকের গতি রোধ করার সাধ্যি ঈশ্বরের বাবারও থাকবে না। কথাটা মনে হলে, অন্তরাত্মা ডুকরে ওঠে।

যাক্‌, O.K. সম্বন্ধে আগে যা লিখেছি, তা পুরো-পুরি নির্ভুল। ইংরেজী ভাষায় সর্ববৃহৎ প্রামাণিক জ্ঞানকোষ তথা বিশ্বকোষ যে Encyclopaedia Britannica, তা বোধ হয় জান। তার ১৯৬৯ সালের সংস্করণের Vol. 16-এর ৯১২ নং পৃষ্ঠায় এই শব্দটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এটাকে 'Okay'-ও লেখা হয়। এর উদ্ভব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। তবে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত।

এখন প্রশ্ন, আমরা কোন্‌ মত গ্রহণ করব? তার আগে বলি, 'slang' শব্দটার অর্থ হল 'অশিষ্ট বা ইতর লোকদের ভাষা বা বুলি।' বর্তমানে ইংরেজী ভাষার সর্বজন স্বীকৃত সবচেয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য অভিধান যে 'The Shorter Oxford English Dictionary', তা আশা করি বলার দরকার করে না। তার তৃতীয় সংস্করণে 'O. K' সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—এটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের slang এবং 'Oll Korrect'-এর abbreviation বা সংক্ষেপন। অর্থাৎ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অশিক্ষিত ইতরজনদের পাল্লায় পড়ে 'all correct' গিয়ে ঠেকেছে 'Oll Korrect'-এ। এবার বোঝ, কোন্‌ বক্তব্য সঠিক।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ কেন, কিভাবে ও কোথায় 'April Fool' কথাটার উৎপত্তি হল? শুধু এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখেই বা এর ব্যবহার কেন?

ঃ এই আর এক ফ্যাসাদ। কিছুকাল আগে এ বিষয়ে এই বিভাগে আলোচনা হয়েছিল। মনে হচ্ছে, তুমি তা পড়নি বা পড়বার সুযোগ পাওনি। যাই হোক, ১লা এপ্রিল মানুষ মানুষকে নিয়ে মজা করে, ঠাট্টা-তামাসা-রসিকতা করে একে অপরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে আনন্দ পায়। এই প্রথা থেকেই এ দিনটির নামকরণ হয়েছে April Fools' Day বা All Fools' Day। কিন্তু কবে, কিভাবে ও কেন এ প্রথার উদ্ভব ঘটল, তা আজও জানা যায় নি। প্রথমটা কিন্তু পুরো-

পুরি ইউরোপীয় সমাজের। আমাদের দেশের সঙ্গে এর আদৌ কোন সামাজিক বা নাড়ীর যোগ নেই। সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে দুনিয়াজোড়া ইউরোপীয় প্রভুত্বের ফলে আরো অনেক বিদেশী রীতিনীতি ও প্রথার সঙ্গে এটাও অন্যান্য পরাধীন দেশের মত আমাদের দেশের জনসমাজের উপর মহলে চালু হয়।

প্রাচীন রোমে অতীতকালে 'হিলারিঅ্যা' (Hilaria) উৎসব পালিত হত মার্চ মাসের শেষ দিকে। ভারতে 'হোলি' উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় ঐ সময়। লক্ষণীয় যে, দুটোই বসন্তকালীন উৎসব। পণ্ডিতদের মতে, এ দুই উৎসবের সঙ্গে মোটামুটি মিল থাকলেও, লোকোৎসব হিসাবে সমাজে April Fools' Day-র উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছে স্বাধীনভাবেই। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে বসন্তকালীন অনিশ্চিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে এর সম্বন্ধ বেশ গভীর বলে মনে হয়। এ সময় প্রকৃতিও যেন মানুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ও মজা করতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে সে রূপ পাল্টায়ঃ এই ঝলমলে রোদ, পরক্ষণেই হয়ত নামে ঝমঝমে বৃষ্টি। সবাই ভিজে একশা, আর সেই সঙ্গে শীতের হি-হি কাঁপুনি। তার পরেই যেন হেসে ফেলে প্রকৃতি—রোদে ঝলমল করে ওঠে সব দিক। প্রকৃতির এই চটুল পরিবেশ থেকে এ প্রথার উৎপত্তি ঘটেছে বলে পণ্ডিতদের অনুমান। ১লা এপ্রিল বোকা-বনা লোকটিকে ফ্রান্সে ডাকা হয় 'ফিশ্' বা মাছ বলে। এপ্রিল মাসে কোকিলের আগমন ঘটে! ওসব দেশে 'কুকু' বা কোকিল হচ্ছে স্থূলবুদ্ধি বা হদ্দ-বোকার প্রতীক। স্কটল্যাণ্ডে তাই এদিন তামাশা-রসিকতার যে শিকার হয়, তাঁর নামকরণ হয় 'কুকু'।

অপূর্ব পাল ও রীণা পাল, বেথুয়াডহরী, নদীয়া

—শ্রদ্ধেয়া বাণীদি, আমরা দু ভাইবোনই কিশোর ভারতীর, বিশেষ করে 'সওয়াল জবাব' বিভাগের একনিষ্ঠ ভক্ত। আপনার জ্ঞানগর্ভ উত্তরগুলি এতই আকর্ষণীয় যে, বইটি হাতে এলে প্রথমেই পড়ি আপনার উত্তরগুলো। যাক, আর বেশি বলব না, তাহলে হয়ত ভাববেন, আমরা আপনাকে up-এ তুলছি। এবার আসল কথায় আসি। নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দিলাম। উত্তর দেবেন কিন্তু।

ঃ বন্ধু, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নে যে দুটো সমস্যা তোমরা তুলে ধরেছ, তা খুবই গুরুতর। প্রথম প্রশ্ন হল, ভারতের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আজ পাশ্চাত্য ভাবধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হচ্ছে এবং 'আল্ট্রা-মডার্ণ' সাজার তাগিদে সাজপোশাকে, চাল-চলনে ও আরও নানাভাবে পাশ্চাত্যের নকল করতে চেষ্টা করছে। এর ফলেই কি আমাদের দেশের একান্নবর্তী পারিবারিক প্রথা ধ্বংসের পথে যাচ্ছে না? তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নানারকম ক্ষতিকর সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রসার ঘটছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এজাতীয় মনোভাব গুরুতর বিপদের কারণ। এর ফলে আমাদের উন্নতি ব্যাপকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ থেকে উদ্ধারের পথ কি

বন্ধু, আগেই বলেছি, দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থের দিক থেকে সমস্যা দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশদ ও ব্যাপক আলোচনার যোগ্য। কিন্তু এ আসরে তার সুযোগ কোথায়? অথচ অন্যদিকে তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করছ, বেশ কিছুকাল যাবৎ সুজনবন্ধু-পরিচালিত 'খোলামনের মেলাতে' আসরটি আবার চালু হয়েছে এবং নানা বিষয় ও সমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা-বিতর্কও চলছে। তোমাদের উত্থাপিত সমস্যা দুটোও ঐ আসরে আলোচনার যোগ্য। আমার পরামর্শ হল, ও দুটো বিষয় তোমরা আরো একটু বিস্তৃতভাবে লিখে, সম্ভব হলে নিজেদের মতামত সহ, ঐ 'খোলামনের মেলাতে, পাঠাও। আমাদের এ আসরের স্থানাভাবের কথা মনে রেখে, আশা করি, তোমরা এ পরামর্শ গ্রহণ করবে। এবার তোমাদের অন্য প্রশ্নে আসা যাক।

—আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন ঃ আমাদের সবচেয়ে বেশী জানতে ইচ্ছে করছে যে, আপনার বয়স কত? এটা জানতে চাওয়ার কারণ হল, কেউ আপনাকে দিদি, কেউ বা আপনাকে দিদিমা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করছে।

ঃ তাতে কি হয়েছে শাস্ত্র পড়েছ? পড়নি তো? হুঁ, তা পড়বে কেন! শাস্ত্রে আছে, ভগবান্‌কে যে যেভাবেই ভজনা করুক না কেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি সেই ভাবেই পূর্ণ করেন। তা আমিই বা কম যাই কিসে, বিশেষ করে তোমাদের কাছে? কি, বুঝতে পারলে তো

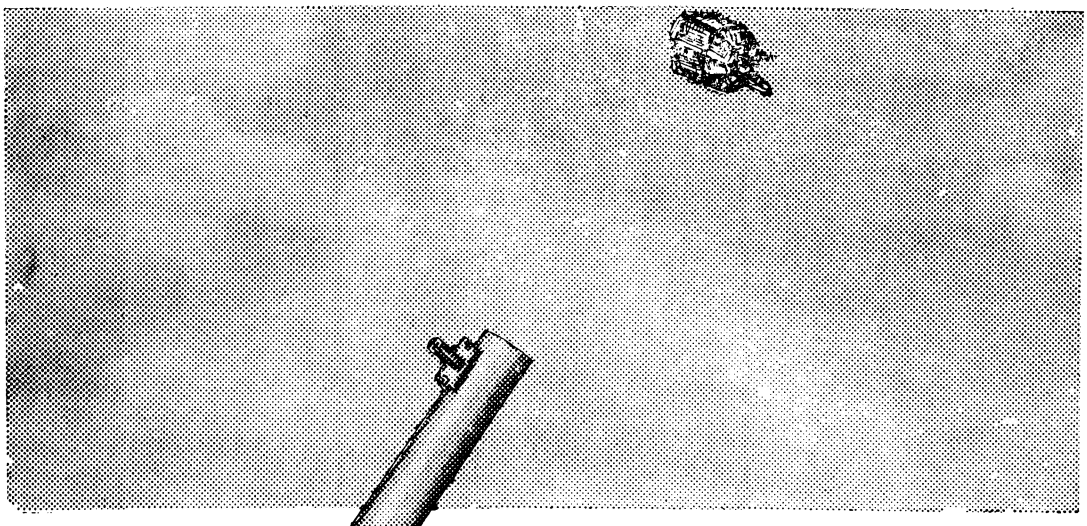

আকাশের সীমা ছাড়িয়ে ও যাবে এগিয়ে আপনিও দেখুন ওর ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে

আপনার ছোট্ট প্রাণচঞ্চল পাঁচ বছর বয়সের খুকু হয়তো ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে এক মহাকাশচারিণী অথবা মহাকাশের মহিলা ডাক্তার। আপনার বাচ্চাকে সমাকভাবে উপলব্ধি করতে দিন তার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতকে। তাকে ঠিক সময়ে সঠিক সুযোগটি পেতে দিন।

এর জন্য প্রয়োজন ঠিকমত পরিকল্পনা করা এবং যথাযথভাবে সঞ্চয় করা।

তার শিক্ষার, কর্মজীবন সুরু-র, পেশার বা বিবাহের সংস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক।

জীবন বীমার নানারকম পলিসির মাধ্যমে আপনি এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন।

আপনার ও আপনার পরিবারের পক্ষে কোন পলিসিটি উপযুক্ত ও সবার সেরা আপনার জীবন বীমার এজেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে জেনে নিন। আজই তৎপর হোন।

শিশু দিবস—১৪ই নভেম্বর।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই।

LIC/134/82 BN

পঞ্চম বর্ষ
Postal Regn. No. WB/EC 126
N. P. Regn. No. R. N. 16599/68
তৃতীয় সংখ্যা

সুলভ মূল্যে সেরা বই

শ্যামাদাস দে-র
স্বপ্নের কৈশোরের জীবন্ত উপন্যাস

রুনু-রুনু-রুনু

মধুমতীর পাড়ে স্বপ্নের সবুজ গ্রাম-বাংলা। সেখানে রঙবেরঙের ফুলেপাতায়

দোল খেয়ে বেড়ায় হাজারো প্রজাপতি-মৌমাছি। সারাবেলা সেখানে পাখ-পাখালির কলরব আর গান। অনাবিল প্রশান্তিঘেরা এই মায়াময় পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে থাকে শ্রীনাথ পণ্ডিতের ছোট ছেলে রুনু—পোশাকী নাম যার রণজিৎ। ঋষিপ্রতিম পিতার আদর্শ ও নীতিবোধ পাথেয় করে সে সংকল্প নেয়—তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। তারপর ?...উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন-সমৃদ্ধ 'রুনু' সিরিজের প্রথম দুটি কাহিনীমালা 'ঘরের কাছেই রুনু' ও 'ঘরছাড়া রুনু' এখন একত্রে প্রকাশিত হতে চলেছে।

শুভব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সমৃদ্ধ বইটির মূল্য মাত্র **নয় টাকা।**

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুলভ জ্যাকেট-সংস্করণ—টাঃ ৫·৫০
বিজ্ঞান-নির্ভর সত্য কাহিনীর সাড়া জাগানো এই সংকলনটির **এখন** একত্রিংশৎ মুদ্রণ চলছে।

● আগামী প্রকাশ ●

বাগিয়ার বিল—হীরালাল চক্রবর্তী

সংকর্ষণ রায়ের
মহৎ মানবতার অনবদ্য উপন্যাস

অগ্নিদিনের অনামা সৈনিক

উত্তর বর্মার মিন্‌বু শহর। নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ। হঠাৎ বিশেষ এক উৎসবের দিনে খুন হলেন এক ইংরাজ—গ্রেগ্‌রি টিল্‌বি! কে এই খুনী ?...ওদিকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে তখন বেজে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্দাম দামামা-ধ্বনি। মালয় সিঙ্গাপুর বেয়ে এগিয়ে আসছে দুর্দম জাপানী সেনা—সামনেই বর্মা। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস, আতঙ্ক। বিচিত্র এই পরিবেশে

ভূতাত্ত্বিকের ছেলের সঙ্গে সখ্যতা জমে গেল অচেনা বর্মী কিশোরের যে ঝোলা কাঁধে প্যাগোডা রঙ করে বেড়ায়...। এটা কি তার প্রকৃত পরিচয় ? ছত্রে ছত্রে শিহরণ, কৌতূহলের মাঝে ভাস্বর হয়ে উঠেছে শ্বাশ্বত মানবতা।

ধ্রুব রায়ের ঝলমলে প্রচ্ছদ ও অপূর্ব সজ্জায় শোভিত বইটির মূল্য মাত্র **ছয় টাকা।**

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
বর্ণাঢ্য অতীত ভারতবর্ষের গল্প-সংকলন

অথ ভারত কথকতা

দাম : মাত্র চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "...লেখক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হলেও তিনি পাকা লেখক। বইখানি মুখ্যতঃ ছোটদের জন্য, কিন্তু বড়রাও খুশি হবেন। গল্প বলার ঢংই লেখকের স্বচ্ছন্দ কৃতিত্ব।....."—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
রক্ত-দোলা-লাগানো জাগরণের উপন্যাস

নীল ঘূর্ণি

সুলভ জ্যাকেট-সংস্করণ : ২৩৮ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম মাত্র **এগারো টাকা** ॥

ছেলেটি ছুটছে ঝড়ের বেগে। ছুটছে তো ছুটছেই।...ছুটছে সে জঙ্গলের দিকে। ছুটতে ছুটতে একসময় সে হাঁফ ছাড়লো—যাক্, জঙ্গল শুরু হলো।... তারপর ?...

অবিস্মরণীয় নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রক্তে দোলা-লাগানো উপন্যাস 'নীল ঘূর্ণি'। ঘৃণিত ব্রিটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক যে দুরন্ত ক্রোধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে, এ তারই এক অনন্য দলিল। তাই তো **যুগান্তর** পত্রিকা লেখেন : এ বই নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের এক জ্বলন্ত রূপ। **পশ্চিম-বঙ্গ পত্রিকা** উল্লেখ করেন :...ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে এই অমূল্য গ্রন্থ লক্ষ

লক্ষ কিশোর তরুণকে সাহায্য করবে, এই আস্থা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারি।.....

বিনামূল্যে বহুবর্ণ পুস্তক-পরিচয়
পুস্তিকার জন্য লিখুন

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯